Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামই একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহিদা খাতুন

রোলঃ 23090121214

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামই একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহিদা খাতুন

রোলঃ 23090121214

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামই একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাহিদা খাতুন, আইডিঃ 23090121214 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামই একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

-

(স্বাক্ষর)

শাহিদা খাতুন

আইডিঃ 23090121214

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ইসলামের পরিচয় 6

সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রমাণ 11

বিশ্বজগতের সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয় 22

মানুষ আল্লাহর ইবাদতের জন্য 24

তাওহীদ 27

মূর্তিপূজার প্রকৃতি 29

তাওহীদের দাবী 31

শিরকের বিভিন্ন প্রকার 33

ইবাদাত 35

ইবাদতের উপকারিতা 39

মু'আমালা ও মু'আশারা-এর গুরুত্ব 42

ইসলামে আখলাক ও চরিত্রের গুরুত্ব 45

মন্দ আখলাক সম্পর্কে হুঁশিয়ারি 47

ইসলাম ইলম ও জ্ঞানসাধনার ধর্ম 48

ইসলাম জীবন-পরিবেষ্টক ধর্ম 51

তাহারাত ও পবিত্রতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা 54

হারাম-হালালভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থা 56

ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে ভক্তি-মুহব্বতের সম্পর্ক 58

ইসলামে মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি তাকওয়া ও ধার্মিকতা 59

ইসলামে নারীর মর্যাদা 65

নফসের ইছলাহ ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা 68

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা: দুটো কথা 71

রোমান সমাজ ব্যবস্থা 72

সামন্তবাদ.....73
ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি.....91
যুবকদের প্রতি আহ্বান.....99

الحمدُ للهِ والصَّلاة والسّلامُ على رَسُولِ اللَّهِ، وَمَنْ تَبِعَهُ بِإحسان إلى يومِ الدِّين،ِ

أما بعد:
قال الله تعالى:

يَنقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم (ٍ

হে আমাদের কাউম, তোমরা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো; তিনি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দেবেন
(আল-আহকাফ: ৪৬: ৩১)

***

قال رسولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:

يا أيها الناس! قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا

হে লোকসকল! তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে
(ইবনে খোযায়মা, হাদীছ নং ১৫৯, ইবনে হিব্বান, ৬৫৬২)

ইসলামের পরিচয়

কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।
(আলে ইমরান, ৩: ১৯)

দ্বীন অর্থ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীন জীবনব্যবস্থা যার মাধ্যমে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সঠিকভাবে যাপন করে মানুষ আখেরাতের অনন্ত জীবনে অফুরন্ত সুখ-শান্তির অধিকারী হতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজের ইচ্ছামত কোন দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। যদি করে, তাতে মানুষেরই বরবাদি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন নবী ও রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আসমানী ওহীরূপে যে তরীকা ও ব্যবস্থা নাযিল করেছেন এবং যার নাম তিনি ইসলাম রেখেছেন সেটাই হলো মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে অনুমোদিত একমাত্র দ্বীন ও জীবনব্যবস্থা এবং দুনিয়া-আখেরাতে কামিয়াবি ও সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ।

পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণ শুধু নির্দিষ্ট কোন জাতির জন্য এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য প্রেরিত হতেন। সুতরাং তাঁদের উপর নাযিলকৃত দ্বীনও ছিলো ঐ সময় এবং ঐ জাতির জন্য নির্ধারিত। এভাবে যুগে যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর কাছেই কোন না কোন নবী ও রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী ও রাসূলরূপে কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون(َ

আর আমি প্রেরণ করিনি আপনাকে, তবে সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারীরূপে; তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সাবা, ৩৪: ২৮)

তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাব আলকোরআন হচ্ছে আখেরী ও চিরস্থায়ী কিতাব, যা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবকে যেমন সত্য বলে সমর্থন করে তেমনি এ কথাও ঘোষণা করে যে,

আলকোরআনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত দ্বীন, সমস্ত কিতাব ও শরী'আত রহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছি এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীনরূপে অনুমোদন করেছি। (আল-মায়িদা, ৫: ৩)

খোলাছা কথা এই হলো যে, ইসলাম নতুন কোন দ্বীন নয়, বরং হযরত আদম আ. এর মাধ্যমে যখন থেকে পৃথিবীতে মানবজীবনের শুরু তখন থেকেই মানুষের জন্য জীবনব্যবস্থারূপে দ্বীনুল ইসলামের শুরু। হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে দ্বীনুল ইসলাম শুধু পূর্ণাঙ্গতা ও সার্বজনীনতা লাভ করেছে এবং পূর্ববর্তী দ্বীন ও শরী'আতের কার্যকরতা রহিত হয়েছে। এখন আখেরী নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাব ও শরী'আত এবং দ্বীনুল ইসলামই হচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বযুগের সর্বজাতির নাজাত ও মুক্তির একমাত্র পথ। সুতরাং প্রতিটি মানবসন্তানের প্রথম কর্তব্য হবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জেনে নেয়া এবং বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের জীবনে তা গ্রহণ করা। ইসলামের পরিচয়সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবিখ্যাত হাদীছটি এই-

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إلهَ إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصومٍ رَمَضَانَ

ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে পাঁচটি জিনিসের উপর। (প্রথমত) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল; আর (দ্বিতীয়ত) ছালাত কায়েম করা এবং (তৃতীয়ত) যাকাত আদায় করা, এবং (চতুর্থত) হজ্ব করা এবং (পঞ্চমত) রামাযানের ছিয়াম পালন করা।'[বোখারী, হাদীছ নং ৮, মুসলিম, হাদীছ নং ১৬]

দ্বীনুল ইসলামের দু'টি ভাগ রয়েছে, যথা ঈমান ও আ'মাল। ঈমান হচ্ছে দ্বীনের বিশ্বাসগত দিক, যাকে হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদতরূপে। অর্থাৎ একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। পক্ষান্তরে আ'মাল হচ্ছে দ্বীনের ব্যবহারগত দিক, যা উপরের হাদীছে ছালাত, যাকাত, হজ্ব ও ছিয়াম দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

ঈমান হচ্ছে এমন কিছু বিশ্বাসকে অন্তরে গ্রহণ করা এবং মুখে স্বীকার করা যা আল্লাহ বান্দার কাছে দাবী করেন, আর ইসলাম হচ্ছে সেই ঈমান ও বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণকৃত আমল ও ইবাদত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। আর ঈমান ও আমল উভয়ের মিলিত বিষয়টিই হচ্ছে দ্বীন, তবে ঈমান ও আমল উভয় অংশকেও একত্রে ইসলাম বলা হয়।

দ্বীনের মূল ভিত্তি বা আসল বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া দ্বীনের অস্তিত্বই হতে পারে না; বাকি আমল ও ইবাদত, তথা ছালাত, যাকাত, হজ্ব ও ছিয়াম ছাড়া দ্বীনের কার্যকরতা যদিও বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তার পরো দ্বীনের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। তাই হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে, যার অন্তরে তিল পরিমাণ ঈমান থাকবে সেও জান্নাতে যাবে, আরা যার অন্তরে ঈমান থাকবে না সে কখনো জান্নাতে যাবে না। পক্ষান্তরে আমলের ত্রুটি আল্লাহ আপন দয়াগুণে মাফ করে দেবেন, কিংবা ইনছাফগুণে সাজা দেবেন এবং নির্ধারিত সাজাভোগের পর ঈমানের কল্যাণে জান্নাতে দাখেল করবেন।

বস্তুত ঈমান ও ইসলামের পরস্পর সম্পর্ককে তুলনা করা যায় মানুষের দেহ ও প্রাণের সম্পর্কের সঙ্গে। ইসলাম যেন দেহ ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আর ঈমান হলো দেহের প্রাণ। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কর্তিত হলেও যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ দেহের মূল্য আছে, কিন্তু প্রাণহীন দেহের কোন মূল্য নেই।

ঈমান ও ইসলামকে সহজে বোঝানোর জন্য হাদীছ শরীফে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুর সঙ্গে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। তাঁবুতে পাঁচটি খুঁটি থাকে। মাঝখানের খুঁটিটি হলো প্রধান। এর উপর তাঁবু দাঁড়িয়ে থাকা নির্ভর করে। এটা ছাড়া তাঁবুর অস্তিত্বই থাকে না। পক্ষান্তরে চারকোণের চারটি খুঁটি থাকলে তাঁবুটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও নিখুঁত থাকে, কিন্তু এই খুঁটি-চারটি যদি না থাকে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাঁবুর কার্যকরতা অনেকাংশে বিলুপ্ত হলেও এর অস্তিত্ব বজায় থাকে। তদ্রূপ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য যে ঈমান তারই উপর ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করে। বাকি ছালাত,যাকাত, হজ্ব ও ছিয়াম হচ্ছে তাঁবুর চারকোণের চারটি খুঁটির মত। এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ঈমানের বিদ্যমানতার কারণে কোনক্রমে ইসলামের অস্তিত্ব বহাল থাকে।

বস্তুত ঈমান ও ইসলাম হচ্ছে একই সত্যের দু'টি দিকমাত্র। অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাসে যেটা হলো ঈমান, বাইরে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলে ও আচরণে সেটাই হলো ইসলাম। ভিতরের বিশ্বাস ও বাইরের আমল,

দু'টি মিলেই হলো মুকাম্মাল দ্বীন। তত্ত্বগতভাবে দু'টি আলাদা হলেও বাস্তবে তা আলাদা নয়। যখনই ঈমানের সঙ্গে আমলের বিচ্ছেদ ঘটে ঈমানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইসলামও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলামের জন্য ঈমানের অস্তিত্ব হলো অপরিহার্য, তদ্রূপ ঈমানের সুরক্ষার জন্যও ইসলামের অপরিহার্য প্রয়োজন। ইসলাম ছাড়া ঈমান ক্রমে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং একসময় আল্লাহ না করুন, ঈমান অন্তর থেকে বের হয়ে যায়।

জানাযার ছালাতে যে দু'আটি পড়া হয় তা থেকে ঈমান ও ইসলামের পরস্পর সম্পর্কের বিষয়টি বোঝা যায়-

اللهم مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحِيهِ على الإسلام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنا فَتَوَفَّه على الإيمَانِ

হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য হতে যাকে আপনি জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের মধ্য হতে যাকে মৃত্যুদান করবেন তাকে ঈমানের উপর মৃত্যুদান করুন।

এর তাৎপর্য এটাই যে, ইসলাম হচ্ছে জীবনযাপনের আহকাম ও বিধান, যা মানুষ পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে জীবিত অবস্থায় পালন করে। আর ঈমান হচ্ছে কিছু বিশ্বাসকে স্বীকার করে নেয়া যা মানুষ জীবিত অবস্থায় অন্তরে লালন করে এবং এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করে। বস্তুত ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করাই হলো নাজাতের শর্ত। তাই ঈমানের উপর মৃত্যুদান করার জন্য এমনকি জানাযার নামাযেও আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয়, যাতে মাইয়েতকে সামনে রেখে যারা জানাযার ছালাতে দাঁড়ায় তারা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

তো ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস, আর ইসলাম হচ্ছে সেই বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী আমল, আর ঈমান ও ইসলাম- উভয়ের মিলিত বিষয়টিই হচ্ছে দ্বীন। তবে অংশের নামে সমগ্রের নামকরণের সূত্রে ঈমান ও আ'মাল- উভয় অংশকেও একত্রে ইসলাম বলা হয়।

কীভাবে একজন মানুষ দ্বীনুল ইসলামের গণ্ডীতে প্রবেশ করে? প্রবেশ করে অন্তরে তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং এই বিশ্বাসের কথা মুখে স্বীকার করার মাধ্যমে। তো কালিমায়ে তাইয়েবা ও কালিমায়ে শাহাদাত হচ্ছে ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামে দাখেল হওয়ার একমাত্র প্রবেশপথ, যথা-

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ عَبدُهُ وَرَسُولُه

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল’

উল্লেখ্য যে, কালিমা তাইয়েবা কালিমায়ে শাহাদাতের আরবী উচ্চারণ ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত নয়, বরং বিষয়বস্তুর উচ্চারণই যথেষ্ট।

তদুপরি আলাদা আলাদা উভয় কালিমাহ শর্ত নয়, বরং যে কোন একটিই যথেষ্ট। কারণ উভয়ের মযমুন তো অভিন্ন। তবে যেহেতু কালিমাহ হচ্ছে ইসলামের শি'আর, বা পরিচয়বৈশিষ্ট্য, যা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে ধারাবাহিকভাবে উম্মাহর মধ্যে চলে আসছে এবং তা শুধু এ জন্য নয় যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবী-ভামী ছিলেন, সেহেতু মূল কালিমাহ-এর উচ্চারণ অবশ্যই জরুরি সুন্নাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রমাণ

দ্বীনুল ইসলামের মূল ভিত্তিই হলো এ মহাসত্য স্বীকার করে নেয়ার উপর যে, মানবজাতিসহ এ বিশাল বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি আপন কুদরত ও প্রজ্ঞা দ্বারা জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং আপন দয়া ও রহমত দ্বারা প্রতিনিয়ত তার প্রতিপালন করছেন, যাকে মানুষ দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি আছেন। স্রষ্টার অস্তিত্বই যদি কোন মূর্খ অস্বীকার করে তাহলে তার কাছে আহকাম ও ইবাদতের আহ্বান জানানো অর্থহীন। আগে তো স্বীকার করতে হবে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব, তারপরই না আসবে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় এবং আদেশ-নিষেধ ও আনুগত্যের প্রশ্ন।
স্রষ্টার অস্তিত্ব এমনই এক পরম সত্য যে, মানবজাতির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে এসেছে। এমনকি বস্তু-বিজ্ঞানের এ চরমোৎকর্ষের যুগেও মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এজন্য কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এ সত্য এমনই উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত যেমন মানুষের নিজের অস্তিত্ব। তাই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটনকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? তিনি বললেন, পাগলামি করো না, এটা তো সহজ কথা, স্রষ্টা আছেন, কারণ আমি আছি!

মহামূর্খ ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয় স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা, কিংবা অস্বীকার করা। তবে দুঃখজনক হলেও এটাই বাস্তব যে, প্রত্যেক যুগে, এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে এত উন্নতি সত্ত্বেও কিছু না কিছু মানুষ নাস্তিক বলে নিজেকে দাবী করে এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। (যদিও বিপদের সময় চরম নাস্তিকও তার নাস্তিকতা ভুলে যায় এবং কট্টর মুশরিকও শিরক পরিত্যাগ করে; এবং শেষ আশ্রয়, বা অবলম্বনরূপে 'পরম শক্তি'কে স্মরণ করে। যেমন কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে)

নাস্তিকের প্রথম কথা হলো 'যা নিজের চোখে দেখি না তার অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না।' অথচ তারাই বলে, 'না দেখা না থাকা প্রমাণ করে না'। এই যে সৃষ্টিজগত, এখানেও বহু কিছু আমরা দেখি না, কিন্তু সেগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করি। বাতাস দেখি না, ইথার দেখি না, বিদ্যুৎ দেখি না, কিন্তু এগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করি। যদি স্বীকার না করি তাহলে এই নাস্তিকই আমাকে বলবে, 'মূর্খ'!

এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টিও রয়েছে যা খালি চোখে দেখা যায় না, বহু শক্তিশালী মাইক্রোস্কপের সাহায্যে দেখা যায়। অর্থাৎ দেখতে না পারার কারণ সেগুলোর অনস্তিত্ব নয়, বরং মানুষের

দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা। তো জ্ঞানী-মূর্খ সবাই স্বীকার করে যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব অনুধাবন করার জন্য আমাদের দেহসত্তায় যতগুলো শক্তি রয়েছে, প্রতিটি শক্তি সীমাবদ্ধ। পাঁচটি ইন্দ্রিয় শক্তির সীমা যেখানে গিয়ে শেষ হয় সেখান থেকে আকল ও বুদ্ধির অনুধাবন শুরু হয়, তাই ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা যেগুলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারি না, আকল দ্বারা সেগুলোর অস্তিত্ব বুঝি এবং স্বীকার করি। কিন্তু
আকল ও বুদ্ধির শক্তিও সীমাবদ্ধ। একটা নির্দিষ্ট সীমার পরে গিয়ে আকলও কোন জ্ঞান দান করে না। তো আকল দ্বারা যা জানা যায় না তা জানারই মাধ্যম হলো অহী, বা উর্ধ্বজগত থেকে স্বয়ং স্রষ্টাকর্তৃক তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তির নিকট প্রেরিত সংবাদ। আকল দ্বারা যা জানা যায় না তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থ হলো যা দেখা যায় না, যা শোনা যায় না তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

তাদের দ্বিতীয় কথা হলো, 'সবকিছু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে', অথচ বিজ্ঞানেরই স্বীকৃত সত্য হলো, নির্মাতা ছাড়া নির্মাণ হয় না ব্যবস্থাপক ছাড়া কোন ব্যবস্থা হয় না এবং নিয়ন্ত্রক ছাড়া নিয়ন্ত্রণ হয় না। তাহলে কীভাবে হতে পারে স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি এবং ব্যবস্থাপক ছাড়া বিশাল বিশ্বজগতের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, কিংবা মহান কোন নিয়ন্ত্রক ছাড়া সব-কিছুর সুনিয়ন্ত্রণ?

নাস্তিকদের মহামূর্খতার সর্বশেষ প্রমাণ হলো এ কথা যে, সবকিছু যদি স্রষ্টার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে? অথচ তারা ভুলে যায়, স্রষ্টার প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য, স্রষ্টার জন্য নয়। যা কারো দ্বারা সৃষ্ট হবে সে স্রষ্টা হতে পারে না, তদ্রূপ যিনি স্রষ্টা হবেন, তিনি কারো দ্বারা সৃষ্ট হতে পারেন না।

দুইয়ের আগে আছে এক; একের আগে আর কিছু নেই শূন্য ছাড়া; তদ্রূপ সৃষ্টির আগে আছেন স্রষ্টা, কিন্তু স্রষ্টার আগে কিছু নেই স্রষ্টা ছাড়া। বিজ্ঞানই বলে, জগতে যত শক্তি আছে, তার একটি উৎস রয়েছে,

কিন্তু সেই উৎসের কোন উৎস নেই। পার্থক্য এই যে, প্রতিটি শক্তির ক্ষেত্রে নাস্তিক বার বার বলে, এটাই উৎস, এর কোন উৎস নেই; পক্ষান্তরে আস্তিক শুধু একবার বলে, সমস্ত শক্তির তিনিই পরম উৎস, তাঁর কোন উৎস নেই। যাবতীয় শক্তির সেই পরম উৎসই হলেন স্রষ্টা, যার কোন স্রষ্টা নেই।

কীভাবে বিশ্বজগতের অস্তিত্ব হলো? কীভাবে প্রাণের সৃষ্টি হলো? সৃষ্টির পরিণাম কী? প্রাণের পরিণতি কী? আরো বড় প্রশ্ন হলো, মানুষের পরিচয় কী? মানুষ কোথেকে এলো, কোথায় যাবে? পৃথিবীতে এই যে জীবন, এর উদ্দেশ্য কী? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা কোথায় খোঁজবো, কার কাছে পাবো?

মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা কি এসব প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারে? না, কিছুতেই না। কারণ মানুষ নিজেই তো বিশাল সৃষ্টিজগতের ক্ষুদ্র একটি অংশ। মানুষ নিজেই তো জানে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সে কত অজ্ঞ?। তার জ্ঞানের পরিধি কত সীমিত?। কতটুকু সে জেনেছে?। কত রহস্য এখনো তার অজানা?! মানুষ আজ যেটাকে সত্য বলে প্রমাণ করে, কাল নিজেই সে তার আবিষ্কৃত সত্যকে ভুল বলে প্রমাণ করে। সুতরাং সে কীভাবে গোটা সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বের এবং নিজের অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচিত করতে পারে? যুক্তি ও বুদ্ধি তো একথাই বলে যে, এসব প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর আসতে পারে শুধু সৃষ্টিজগতের ঊর্ধ্বসত্তা ও উর্ধ্বশক্তির কাছ থেকে, যিনি নিজে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টির সকল রহস্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তাই আলকোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (ُ

তিনিই কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন; অথচ তিনিই হলেন সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। (সূরাতুল-মুলক, ৬৭: ১৪)

সৃষ্টিজগতের ঊর্ধ্বসত্তা ও ঊর্ধ্বশক্তিই হলেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ করে এসকল প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন, আর আদেশ করেছেন রাসূলের উপর অবতীর্ণ ওহীকে সত্য বলে বিশ্বাস করার। এই বিশ্বাসেরই নাম হলো ঈমান।

বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব প্রমাণ করে। মানুষ যদি সৃষ্টিজগত সম্পর্কে একটু চিন্তা করে এবং আন্তরিক-ভাবেই পরম সত্যের সন্ধান পেতে চায় তাহলে অবশ্যই সে আকাশের তারা ও গাছের ফুল হতে এবং পর্বতের চূড়া ও সাগরের তলদেশ হতে, এমনকি তার নিজের এই ক্ষুদ্র দেহটির মধ্যেও সে পাবে সর্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব ও ফিতরতের মধ্যেই রেখে দিয়েছেন চিন্তাশক্তি, আর তাকে আদেশ করেছেন সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা

করার; চিন্তা করে স্রষ্টাকে চেনার এবং সমগ্র সৃষ্টির, অতপর নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করার। ইরশাদ হয়েছে-

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ(2)

আর তিনিই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। (তিনিই) সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। আর তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। (আল-আন'আম, ৬: ১০২)

বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাও মানুষকে বারবার বলেছেন, সৃষ্টির দিকে তাকাতে এবং সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করতে। এ চিন্তা কিসের জন্য? শুধু কি বুদ্ধিবৃত্তিক বিনোদন, বা প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য? না; বরং এ চিন্তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রষ্টাকে চেনা; স্রষ্টার পরিচয় অর্জন করা এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বোঝা।

ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(

তিনিই ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সকল। অতঃপর তিনি অভিমুখী হলেন আকাশের প্রতি, অনন্তর তিনি সেটিকে সপ্তআকাশে সুবিন্যস্ত করলেন। আর তিনিই সর্ববিষয়ে অবগত। (সূরাতুল বাকারাহ, ২: ২৯)

আরো ইরশাদ হচ্ছে কিছুটা যেন তিরস্কার ও ভর্ৎসনার ভাষায় উদ্বুদ্ধ করার শৈলীতে-

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ - وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَت - وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ - وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

তো তারা কি তাকায় না উটের দিকে, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে, কীভাবে তা উত্তোলন করা হয়েছে? এবং পাহাড়-পর্বতের দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে, কীভাবে তা
সমতল করা হয়েছে? (সূরাতুল গাশিয়াহ, ৮৮: ১৭-২০)

উট মরুভূমির প্রাণী। তাই তাকে মরুভূমিতে চলার পূর্ণ উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ভিতরে রাখা হয়েছে পানি সংরক্ষণের আধার, যা অন্য প্রাণীর নেই। তাই উট দিনের পর দিন পানি ছাড়া চলতে পারে। যখন খাদ্যের প্রয়োজন হয় তখন কুঁজের মধ্যে সঞ্চিত চর্বি তার খাদ্যের প্রয়োজন পূর্ণ করে। উটের পায়ের পাতা এমন যে, নরম বালুতে তা দেবে যায় না।

ছোট্ট একটি ছাদও তো খুঁটি ছাড়া কল্পনা করা যায় না, অথচ এই বিশাল আকাশ কীভাবে কোন খুঁটি ছাড়া স্থিত আছে?!।

কত অসংখ্য পাহাড়-পর্বত পৃথিবীর এখানে সেখানে স্থাপন করা হয়েছে, যা না হলে পৃথিবী এমন প্রবলভাবে দুলতো যে তাতে মানুষের বাস করা তো দূরের কথা, সোজা দাঁড়িয়ে থাকাই সম্ভব হতো না।

পৃথিবী যদি সমতল না হতো, মানুষের বাসোপযোগী হতো না। একদিকে পর্বতচূড়া, অন্যদিকে সাগরের তলদেশ; এর মাঝে সম্পূর্ণ বাস-উপযোগী সমতল ভূমি, এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে, যদি এর পেছনে মহান স্রষ্টার অসীম প্রজ্ঞা কাজ না করতো? চিন্তা করার তো আরো অনেক বিষয় রয়েছে, তবে এমন চারটি বিষয় উল্লেখ করা হলো যা চোখ খুললেই হে মরুআরবের বাসিন্দা, তোমার নযরে পড়ে। এসবের দিকে তাকালেই তো স্রষ্টার অস্তিত্ব তুমি একেবারে চোখে দেখার মত অনুভব করতে পারো!

আরো ইরশাদ হয়েছে-

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ - أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا - فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا - وَعِنَبًا وَقَضْبًا - وَزَيْتُونَا وَنَخْلاً - وَحَدَائِقَ غُلْبًا - وَفَاكِهَةً وَأَبًّا - مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلا نَعَامِكُم

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমিই তো প্রচুর বারি বর্ষণ করি; তারপর ভূমিকে যথাযথ বিদীর্ণ করি, অনন্তর তাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, সবজি, যায়তুন, খেজুর, বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান, ফল ও গবাদিপশুর খাদ্য; তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পশুদের জন্য ভোগ্যবস্তুরূপে।

(আবাসা, ৮০ঃ২৪-৩২)

খাদ্য ছাড়া মানুষ ও পশু-প্রাণীর কি বেঁচে থাকার কোন উপায় আছে? নেই। এ প্রশ্ন না হয় থাক, বীজ সে কোথায় পেলো, কিন্তু সে তো শুধু ভূমিতে বীজ ফেলে দেয়; তারপর? জলসিঞ্চন ছাড়া তো শস্য উৎপন্ন হতে পারে না! তো আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণের যাবতীয় প্রক্রিয়া কে সম্পন্ন করে? কার কুদরতে ভূমি ভেদ করে বীজ অঙ্কুরিত হয়? কত রকমের শস্যদানা ও ফলমূল খাদ্যরূপে সে লাভ করে! কে এসব খাদ্যের স্রষ্টা? সে তো আমি। মানুষ এসম্পর্কে যত বেশী চিন্তা করবে; তার চিন্তা যত বেশী অন্তর্মূলে প্রবেশ করবে সে তত বেশী রহস্যের সন্ধান পাবে এবং অবাক হবে। সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এসবের পিছনে অবশ্যই রয়েছেন মহাশক্তি ও মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী এক সত্তা, যার নাম আল্লাহ।

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

অতি অবশ্যই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। তাদের উদরে যে গোবর ও রক্ত রয়েছে তার মাঝখান দিয়ে আমি তোমাদের পান করাই নির্ভেজাল দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুপেয়।(আন-নাহল, ১৬৪ঃ৬৬)

সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন কত লক্ষ পশুর ওলান থেকে কত কোটি লিটার দুধ বের হয়ে আসে, আর মানুষ তা পান করে! দুধের মত সুপেয়, স্বাস্থ্যকর ও মূল্যবান বস্তু মানুষ কত সহজেই না পেয়ে যায়! কিন্তু কেউ কি ভাবে, পশুর উদরে বিদ্যমান নাপাক রক্ত ও গোবরের মধ্য হতে এমন স্বচ্ছ-শুভ্র ও পবিত্র পানীয় কীভাবে তৈরী হয়? পশুর উদর হতে নাপাক
গোবরমূত্র বের হয়, আবার বের হয় পাকছাফ দুধ, কিন্তু উভয়ের বের হওয়ার পদ্ধতি কত ভিন্ন এবং কত উপযোগী! কেউ কি চিন্তা করে, এর পিছনে কার হিকমত ও কুদরত, কার কৌশল ও প্রজ্ঞা, কার দয়া ও করুণা ক্রিয়াশীল? মানুষ যদি একটু চিন্তা করে তাহলেই তো বুঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহ ছাড়া কেউ নন।

আরো ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُون

নিঃসন্দেহে আল্লাহ-ই বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি নির্গত করেন প্রাণসম্পন্নকে নিষ্প্রাণ হতে এবং নির্গত করেন নিষ্প্রাণকে প্রাণসম্পন্ন হতে। তিনিই তো (তোমাদের) আল্লাহ! তো কোথায় তোমাদের ঘোরানো ফেরানো হচ্ছে?

অর্থাৎ আমি যে তোমাদের আল্লাহ, আমাকে চিনতে না পেরে এই যে তোমরা গোমরাহি ও ভ্রষ্টতার শিকার হও এর কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই যে, পরম সত্যকে লাভ করার জন্য তোমরা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। দেখো, তোমরা ভূমিতে বীজ, বা আঁটি বপণ করো। বলো দেখি, বীজ ও আঁটি, কিংবা ভূমি ও মাটি, কোনটারই কি বোধ আছে, শক্তি আছে? তাহলে কার গায়বি কুদরত ও অদৃশ্য শক্তির স্পর্শে এত শক্ত মাটি ভেদ করে বীজ ও আঁটি থেকে এমন কোমল অঙ্কুর বের হয়ে আসে? তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। প্রতিনিয়ত তোমরা মুরগী থেকে ডিম বের হতে, আবার ডিম থেকে ছানা বের হতে দেখো। এ প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলে আসছে। আল্লাহর পরিচয় লাভ করার, তাঁর সৃষ্টিকুশলতা অনুধাবন করার এবং তাঁর মহাকুদরত ও প্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কী সুস্পষ্ট নির্দশন রয়েছে তোমাদের সামনে। তবু কি তোমরা চিন্তা করবে না! তবু কি খবিছ শয়তান তোমাদের ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে ঘোরপাক খাওয়াতে থাকবে?!

আরো ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لأولى الألبابِ

নিঃসন্দেহে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের বিবর্তনে কতিপয় নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য;
(আলে ইমরান, ৩: ১৯০)

এই যে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা, এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটা হলো সাধারণ চিন্তা, যা যে কোন মানুষ করতে পারে এবং তাতেও সে তাঁর মত করে আল্লাহর মা'রিফাত হাছিল করতে পারে। আরেকটা হলো জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা যা সাধারণ মানুষের কাজ নয়, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর কাজ, আর এ চিন্তা-গবেষণার কোন শেষ নেই। জীবন শেষ হয়ে যাবে, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাবে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম অতিক্রান্ত হবে, কিন্তু চিন্তা-গবেষণা শেষ হবে না। সৃষ্টির অপার রহস্যের কোন কূলকিনারা পাওয়া যাবে না। উপরের আয়াতে 'উলুল আলবাব' বা জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারীদের কথা বলে আল্লাহ তা'আলা

সম্ভবত এই ইঙ্গিত করেছেন যে, সাধারণ মানুষ তো সাধারণ চিন্তা-ভাবনা করবে, তবে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও আকল-বুদ্ধির অধিকারীগণ যেন তাদের স্তর থেকে চিন্তা-গবেষণা করে।

এ চিন্তা-গবেষণার উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা তাহলে এটাই হবে শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তখন আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে বান্দার সামনে সৃষ্টিজগতের রহস্যরাজি উন্মোচিত করবেন এবং বিভিন্ন শক্তিকে তার অনুগত করে দেবেন, আর সে তা দ্বারা উপকৃত হবে।

আফসোস তো এই যে, মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণ তো সৃষ্টিজগত সম্পর্কে উপরোক্ত স্তরের চিন্তাভাবনা ছেড়েই দিয়েছে, তাই সৃষ্টির শক্তি ও কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন কাফির-মুশরিক জাতি সৃষ্টিজগত সম্পর্কে বিস্ময়কর পর্যায়ে চিন্তা-গবেষণা তো করছে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কখনোই স্রষ্টার পরিচয় এবং তাঁর অসীম কুদরত অনুধাবন করা নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদ অর্জন করা এবং তা থেকে জাগতিক উপকার লাভ করা। ফলে তারা প্রকৃতির বিপুল শক্তি ও সম্পদ তো অর্জন করছে, কিন্তু স্রষ্টার পরিচয় লাভকরা, বা তাঁর অসীম কুদরত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদ দ্বারা শেষ পর্যন্ত না তারা নিজেরা প্রকৃত কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে, না সমগ্র মানবজাতির তাতে কোন কল্যাণ হচ্ছে।

আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وفِي الْأَرْضِ وَايَتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُون. ۝

আর ভূমিতে রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন মুমিনদের জন্য, আর (রয়েছে এমনকি) তোমাদের নিজেদেরও মধ্যে, তো তোমরা কি অবলোকন করবে না?(যারিয়াত, ৫১: ২০-২১)

অর্থাৎ মানুষ যেন আল্লাহকে চিনতে পারে, আল্লাহর কুদরত ও হিকমত বুঝতে পারে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে পারে সে জন্য আল্লাহ পৃথিবীতে বিভিন্ন নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে, পাশাপাশি বিভিন্ন ভূখণ্ড, কিন্তু প্রতিটির গুণ ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। কোনটি উর্বর, কোনটি ঊষর: কোনটি একপ্রকার ফল ও ফসলের উপযোগী, কোনটি অন্য প্রকারের। তদুপরি আকারে আকৃতিতে, স্বাদে ও রসে রয়েছে বিভিন্নতা। কোনটি

কোনটির চেয়ে উৎকৃষ্ট। অথচ সব ভূখণ্ড একই পানিতে সিঞ্চিত, একই সূর্যের আলো তাতে পড়ে।

তো ভূমিতে যেমন বিভিন্ন নিদর্শন ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, তেমনি হে মানুষ, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে আমাকে চেনার জন্য এবং আমার কুদরত অনুধাবন করার জন্য বিভিন্ন নিদর্শন। মাতৃগর্ভে তোমার এই দেহ, আকার-অবয়ব, চোখ-কান-নাক, জিহ্বা কে তৈরী করেছেন? এই দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, বাকশক্তি কে দান করেছেন? এই মস্তিষ্ক ও তার চিন্তাশক্তি কোথেকে তুমি পেলে? জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে এত নিখুঁতভাবে কাজ করছে? দেহের প্রতিটি অঙ্গের ব্যবস্থাপনা কত সূক্ষ্ম ও জটিল! একটু চিন্তা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে, এর পেছনে রয়েছে মহাকুদরতের অধিকারী এক অদৃশ্য সত্তা। সে
আমি, তোমাদের আল্লাহ! এক আয়াতে তো আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণ যেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করছেন-

أ في اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

আল্লাহ সম্পর্কেই সন্দেহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর শ্রষ্টা?।
(ইবরাহীম, ১৪ঃ১০)

এভাবে আরো বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করার, যাতে সে সর্বস্রষ্টা আল্লাহকে চিনতে পারে, তাঁর কুদরত বুঝতে পারে, আর তাঁর প্রতি ঈমান আনতে পারে। কারণ সৃষ্টিজগতের ছোট থেকে ছোট এবং বড় থেকে বড় প্রতিটি বস্তু স্রষ্টার উপস্থিতি ঘোষণা করে। মানুষ যদি 'অন্ধ' না হয় তাহলে প্রতিটি সৃষ্টির ছায়ায় সে দেখতে পাবে স্রষ্টার কুদরতের ছায়া। ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি অস্তিত্ব পরম একটি একক অস্তিত্বের ঘোষণা দান করে। সুতরাং যদি কিতাব নাযিল না করা হতো এবং যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ না করা হতো তাহলেও শুধু আকল-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ব্যবহার করেই মানুষকে বিশ্বাস করতেই হতো যে, এ বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টির পিছনে অবশ্যই রয়েছেন মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী একজন মহান স্রষ্টা, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী; পরম কুশলতার সঙ্গে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে হবে যে, সৃষ্টিজগত সম্পর্কে এই যে চিন্তা -ভাবনার আদেশ, এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী? আল্লাহর যাত ও সত্তা এবং গুণ ও ছিফাত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান

অর্জন করা? অথবা সৃষ্টিজগতের সকল রহস্য উন্মোচন করে ফেলা? মোটেই না, বরং এই চিন্তা-ভাবনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যেন তার চিন্তার সীমাবদ্ধতা, জ্ঞানের স্বল্পতা এবং তার অভিজ্ঞতার অনির্ভরতা বুঝতে পারে; বুঝতে পেরে আল্লাহর যাত ও সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার কখনো যেন দুঃসাহস না করে, বরং সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করে করে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে; আর এ আত্মসমর্পণের মধ্যেই যেন সে জীবনের সমাপ্তিতে উপনীত হয়। মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا(

আর তোমাদের দান করা হয়নি জ্ঞান থেকে, কিন্তু খুবই সামান্য।

(আল-ইসরা, ১৭৪৮৫)

আজ থেকে হাজার বছর আগে যেমন মানুষের জ্ঞান সামান্য ছিলো, এখনো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ চরমোৎকর্ষের যুগেও মানুষের জ্ঞান সামান্য। আজ থেকে হাজার বছর পরেও মানুষের জ্ঞান সামান্যই থাকবে। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত এ আয়াত একই রকম সত্যরূপে বিরাজ করবে। কারণ মানুষ যতই জানবে, তার অজানার পরিমাণ হবে জানার চেয়ে লক্ষকোটি গুণ বেশী।

অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের অসীমতা সম্পর্কে মানুষের বোধগম্য করে আলকোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ
كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا

আপনি বলুন, যদি সাগর কালি হতো আমার রবের কালিমাহ (জ্ঞান) বয়ান করার জন্য তাহলে আমার রবের কালিমাহ ফুরোনোর আগে সাগর ফুরিয়ে যেতো, যদিও সাগরের অনুরূপ সম্পূরক আমি আনয়ন করতাম।
(আল-কাহফ, ১৮: ১০৯)

পক্ষান্তরে মানবজ্ঞানের সামান্যতা এবং ইলমে ইলাহীর অসীমতা সম্পর্কে একটি উপমা বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা ও হযরত খিযির আ. এর সেই প্রসিদ্ধ ঘটনায়। মূল ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে কোরআনে, আর উপমাটি বর্ণিত হয়েছে হাদীছ শরীফে। তারা যখন জাহাযে আরোহণ করলেন

তখন একটি পাখী সাগর থেকে ঠোঁটে করে পানি নিলো, আর হযরত খিযির আ. বললেন, হে মূসা, আমার এবং তোমার (এবং সমস্ত মানবজাতির) জ্ঞানের পরিমাণ আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় ততটুকুই যতটুকু এই সাগরের তুলনায় পাখীর ঠোঁটের জলবিন্দু।
বস্তুত যিনি যত বড় জ্ঞানী তিনি নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তত বেশী অবগত এবং স্রষ্টার জ্ঞানের অসীমতার সামনে তত বেশী অবনত। তার জ্ঞান-বুদ্ধি যখন ঊর্ধ্বজগতের কোন জ্ঞান অনুধাবনে ব্যর্থ হয় তখন তিনি বিনয়ের সঙ্গে ঊর্ধ্বজাগতিক সত্যকেই পরম সত্যরূপে গ্রহণ করেন।

পক্ষান্তরে জানে যে যত সামান্য সে তত দাম্ভিক। উর্ধ্বজাগতিক সত্যকেও সে নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করে, আর বুঝতে না পেরে তা প্রত্যাখ্যান করে।

এ যে কত বড় ভুল তা মানুষ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারে। এ মহা-বিশ্বজগতের কতটুকু আমরা দেখতে পাই? শুধু পৃথিবীর যাবতীয় রহস্য উন্মোচন করা কি একটি জীবনে সম্ভব? মহাশূন্যের কত আলোকবর্ষ দূরে আমরা যেতে পারবো? সৃষ্টির শেষ সীমানা কোথায়? সব থাক, শুধু মানব -দেহের রহস্য উন্মোচন করাও কি সম্ভব? মানুষ যতটুকু জেনেছে তাতেই তো সে বিস্ময়ে বিমূঢ়। আরো কত রহস্য এখনো রয়ে গেছে তার অজ্ঞাত, যার অতি ক্ষুদ্র কিছু অংশ জানতেই তো পার হয়ে যাবে আরো বহু জীবন। তো সৃষ্টি সম্পর্কে এ বিপুল অজ্ঞতা নিয়ে মানুষ কীভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কথা বলার স্পর্ধা দেখাতে পারে?! বিনয় ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই কি তার কর্তব্য নয়? ব্যস, শুধু এটুকুই হতে পারে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনার অর্জন।
এ তো হলো সেই নগণ্য সংখ্যক মানুষ সম্পর্কে আলকোরআনের আহ্বান, মহান স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে যারা অন্ধ এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত।

পক্ষান্তরে মানবজাতির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্বীকার করে এসেছে। কারণ স্রষ্টার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস মানুষের স্বভাব ও ফিতরতের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা গচ্ছিত রেখেছেন। তো তাদের উদ্দেশ্যে আলকোরআনের আহ্বান হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করার।

বিশ্বজগতের সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়

কিছু মূর্খ মানুষ আগেও মনে করেছে, এখনো মনে করে; বিশ্বজগতের সৃষ্টির পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই। হয় এর পিছনে কোন স্রষ্টাই নেই,
কিংবা যিনি আছেন, তিনি খেয়ালের বশেই সৃষ্টি করেছেন। তাদের মূর্খতাকে খণ্ডন করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۚ

আর আমি সৃষ্টি করিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী কোনকিছু অযথা। তা তো ঐলোকদের ধারণা যারা কুফুরি করেছে। সুতরাং যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য বরবাদি হোক জাহান্নামের কারণে।
(ছোয়াদ, ৩৮ঃ২৭)

চিন্তা করে দেখুন; এই যে সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী মানুষ, তারও তো প্রতিটি কাজের পিছনে থাকে কোন না কোন উদ্দেশ্য! তো মানুষই যখন উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ করে না তখন এটা কীভাবে হতে পারে যে, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করবেন অযথা ও উদ্দেশ্যহীন! না, কিছুতেই তা হতে পারে না। নির্বোধই শুধু ভাবতে পারে এমন ভাবনা।

হাঁ, আসল সত্য এই যে, সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার অবশ্যই মহান কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। কী সে উদ্দেশ্য? কেন বিশ্বজগতের সৃষ্টি? কেনই বা মানবজাতির সৃষ্টি?

আসমান-যমীন, চাঁদ-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর-মহাসাগর, আলো-বাতাস, আগুন-পানি, বৃক্ষলতা, ফল ও ফসল, পশু-পাখী, এককথায় বিশ্ব -জগতের ছোট-বড় সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, যাতে মানুষ পৃথিবীতে প্রাণ ধারণ করতে পারে এবং পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে।

সৃষ্টিজগতের বস্তুনিচয় যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে মানবজাতির শুধু জীবনধারণই নয়, বরং প্রাণধারণই অসম্ভব হয়ে পড়তো। সুতরাং বোঝা গেলো, সৃষ্টি-জগতের সবকিছু মানুষের জন্য এবং স্রষ্টার পক্ষ হতে মানুষের সেবায় নিয়োজিত। বারবার سخر لكم (তোমাদের জন্য বশীভূত করেছেন) বলে সে কথাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন; ইরশাদ হয়েছে-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَار َ

আল্লাহ তো ঐ মাহন সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, আর অবতারণ করেছেন আকাশ থেকে পানি, অনন্তর তা দ্বারা বের করেছেন ফলফলাদি তোমাদের জন্য রিযিকরূপে। আর বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য জলযানকে যাতে তা ভেসে চলে সাগরে তাঁর আদেশে, আর বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য নদ-নদী, আর বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য সূর্য ও চাঁদ, এমন অবস্থায় যে, ঐদু'টি নিরন্তর কর্মরত, আর বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য রাত ও দিন।
(ইবরাহীম, ১৪: ৩২-৩৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝

তো তোমরা কি দেখো না যে, আল্লাহ বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু রয়েছে পৃথিবীতে। তিনি তোমাদের উপর অঢেল করেছেন তাঁর নেয়ামত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত; আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে ইলম ছাড়া এবং হিদায়াত ছাড়া এবং আলোদানকারী কিতাব ছাড়া।
(লোকমান, ৩১: ২০)

মানুষ আল্লাহর ইবাদতের জন্য

বিশ্বজগতের সবকিছু মানুষের জন্য। কারণ প্রাণধারণ ও জীবনযাপনের জন্য এগুলো মানুষের প্রয়োজন, কিন্তু মানুষ কোন কিছুর জন্য নয়। কারণ সৃষ্টিজগতের কোন ব্যবস্থা মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ যদি না থাকে তাহলেও সৃষ্টিজগত একইভাবে বিদ্যমান থাকবে। মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাহলে কী? আল্লাহ স্বয়ং ইরশাদ করেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর আমি সৃষ্টি করিনি জ্বিন ও মানবসম্প্রদায়কে, তবে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য। (যারিয়াত, ৫১: ৫৬)

প্রথমেই আমাদের জানতে হবে, ইবাদতের হাকীকত কী? এককথায় ইবাদতের অর্থ জীবনের সবকিছু আল্লাহর অনুগত করা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

মানুষের এ অধিকার নেই যে, সে নিজের পছন্দমত ইবাদতের কোন তরীকা নির্ধারণ করবে। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে মানুষ কীভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হবে? কীভাবে সে জানবে, আল্লাহর ইবাদত করার এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার সঠিক উপায় ও পদ্ধতি কী?

তো মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং মানুষের কাছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের সঠিক

তরীকা বাতলে দেয়ার জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এভাবে সর্বশেষে সমগ্র মানব-জাতির জন্য হিদায়াতরূপে তিনি নাযিল করেছেন আলকোরআন এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই এবং কোরআনের পরে আর কোন শরী'আত নেই। এটাই হলো আদ্-দ্বীনুল কায়্যিম, যার অপর
নাম হলো ইসলাম। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَامُ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।'

(আলে ইমরান, ৩: ১৯)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُون َ

আর আমি প্রেরণ করিনি আপনাকে, তবে সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারীরূপে; তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সাবা, ৩৪: ২৮)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ

আর আমি নাযিল করেছি আপনার উপর কিতাব, সকল বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করার জন্য এবং মুসলিমদের জন্য হেদায়াত ও রহমত ও সুসংবাদ
হওয়ার জন্য। (আন-নহল, ১৬: ৮৯)

তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাব আলকোরআন হচ্ছে আখেরি কিতাব, যা পূর্ববর্তী সব কিতাবকে আসমানী কিতাবরূপে যেমন সমর্থন ও সত্যায়ন করে তেমনি একথাও ঘোষণা করে যে, আলকোরআনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত দ্বীন ও শরী'আত এবং সমস্ত আসমানী কিতাব মানসূখ বা রহিত করা হয়েছে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের সময় আরাফার ময়দানে সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয় তাতে ইরশাদ হয়েছে-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছি এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীনরূপে অনুমোদন করেছি।' (আল-মাইদাহ, ৫:৩)

পূর্ববর্তী সবযুগের সবজাতির ইহ ও পরকালীন মুক্তির যেমন একমাত্র পথ ছিলো এই দ্বীনুল ইসলাম, যা ঐ যুগের ঐ জাতির নবী বা রাসূলের উপর নাযিল হয়েছে, তেমনি আখেরি নবীর উপর অবতীর্ণ দ্বীনুল ইসলামই হচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবের নাজাত ও মুক্তির একমাত্র পথ। সুতরাং দ্বীনুল ইসলামের শুরু হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নয়, বরং হযরত আদম (আ.) এর আগমনের মাধ্যমে যখন থেকে পৃথিবীতে মানবজীবন শুরু, তখন থেকেই তাদের জীবনব্যবস্থারূপে দ্বীনুল ইসলামের শুরু। হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে দ্বীনুল ইসলাম শুধু পূর্ণাঙ্গতা ও সার্বজনীনতা লাভ করেছে এবং পূর্ববর্তী দ্বীন ও শরী'আতের কার্যকরতা রহিত হয়েছে।

তাওহীদ

মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রথম দাবী হলো الإيمان توحيد الله। অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তবে এখানে ঈমান ও তাওহীদের হাকীকত অবশ্যই বুঝে নিতে হবে। কারণ কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এই পরিমাণ ঈমান ও তাওহীদ তো মক্কার মুশরিকদের মধ্যেও ছিলো যে, মানুষ এবং সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ; সবার রিযিকদাতাও একমাত্র আল্লাহ; সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ও পরিচালকও একমাত্র আল্লাহ, অন্যকোন সত্তা নয়। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
مد لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُون

যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে এবং (কে) সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ? তাহলে কোথায় তাদের ঘোরানো ফেরানো হচ্ছে? (আনকাবূত, ২৯: ৬১)
আরো ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَن تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَى وَمَن يُدَبِّرُ
الأمر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُون:

(হে নবী,) আপনি বলুন, কে তোমাদের রিযিক দান করে আসমান ও যমীন থেকে, কিংবা কে কর্ণসমূহ ও চক্ষুসমূহের অধিকারী এবং কে প্রাণধারীকে প্রাণহীন থেকে বের করে এবং প্রাণহীনকে প্রাণধারী থেকে বের করে এবং কে যাবতীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করে? তো অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ; তো বলুন, তাহলে তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে
না?! (ইউনুস, ১০৪:৩১)

তো সৃষ্টি, অন্নদান, মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করার পরো আহলে আরব তাওহীদী ও মুমিন হলো না, মুশরিক হলো; কী কারণে? কারণ এই যে, যদিও আল্লাহকে তারা এক বলে স্বীকার করতো এবং তাদের উপাস্যকে আল্লাহর মাখলুক এবং আল্লাহর অধীন মনে করতো, কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহর সঙ্গে নিকটসম্পর্কের কারণে তাদের মধ্যে আল্লাহরই দেয়া এমন শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে মানুষকে

তারা কিছু দিতে পারে, আবার অসন্তুষ্ট হলে নাও দিতে পারে। তাই আল্লাহর ইবাদত সত্ত্বেও তাদের সন্তুষ্টি অর্জন এবং অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদের উপাসনা করা কর্তব্য।

এ আন্তঃবিশ্বাস থেকেই তারা আল্লাহর সঙ্গে, কিংবা আল্লাহর পরে তাদেরও পূজা-উপাসনা ও ইবাদত করতো। তাদের সিজদা করতো এবং তাদের নামে বলি দিতো, আর তাদের কাছে বিভিন্ন প্রয়োজন প্রার্থনা
করতো। মোটকথা তাদের উপাস্যগুলো আল্লাহর সমকক্ষ ছিলো না, তবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত ছিলো এবং জীবনের সৌভাগা ও দুর্ভাগ্য এবং প্রাপ্তি ও বঞ্চনার ক্ষেত্রে তাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির দখল ছিলো; সর্বোপরি আল্লাহর নিকট তাদের সুফারিশের মূল্য ছিলো।

তাই তাদের উপাসনার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে বিশ্বাস করতো। এটাকেই কোরআনে শিরক সাব্যস্ত করে ঘোষণা করা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করা কিছুতেই মাফ করবেন না, আর মাফ করবেন এর চেয়ে নীচের গোনাহ, যাকে ইচ্ছা করেন। আর যে আল্লাহর

সঙ্গে শরীক করে সে তো বিরাট পাপ করে। (নিসা, ৪:৪৮)

মূর্তিপূজার প্রকৃতি

পৃথিবীতে কিছু মূর্খ অবশ্য এমনো ছিলো এবং আছে যারা স্বয়ং প্রস্তর-মূর্তিকেই ক্ষমতার অধিকারী মনে করে সরাসরি ওগুলোরই পূজা-উপাসনা করতো, বা করে। এজন্যই উপাস্য মূর্তিদের সম্বোধন করে হযরত ইবরাহীম আ. বলেছিলেন-

فَرَاغَ إِلَى وَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ

অনন্তর তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর বললেন, কী হলো (সামনে রাখা প্রসাদ) খাচ্ছো না যে! কী হলো, কথা বলছো না যে!!
(ছাফ্ফাত, ৩৭: ৯১)

আর মূর্তির পূজারীদের লক্ষ্য করে বলেছেন-

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

তিনি বললেন, তোমরা কি পূজা করো নিজেদের খোদাই করা মূর্তির, অথচ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা তৈরী করো তাদের! (ছাফফাত, ৩৭ঃ৯৫)

এধরণের চূড়ান্ত শিরক সম্পর্কেই বলা হয়েছে, তোমরা যাদের পূজা করো তারা তো সবাই মিলেও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকি

যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তার কাছ থেকে তা তারা উদ্ধার করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান অধিকাংশ মুশরিকের অবস্থা এই যে, প্রস্তরমূর্তিগুলো তাদের আসল উপাস্য নয়, বরং যে সকল কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক নারী-পুরুষকে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত 'ঐশী ক্ষমতা'র অধিকারী মনে করতো তাদের নামে তৈরী মূর্তি সামনে রেখে প্রকৃতপক্ষে তাদের পূজা করতো। যেমন কোরআনে ওয়াদ, ইয়াগূছ, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি কিছু নাম এসেছে।

যখন কোন সম্প্রদায়ের কোন সাধুপুরুষ মৃত্যুবরণ করতেন, লোকেরা স্মৃতিরক্ষা বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর ভাস্কর্য তৈরী করতো। কিন্তু এক দু'প্রজন্ম পর শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ তাদের ঐশী ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদের নামে তৈরী মূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে। কিছু লোকের ধারণা হলো, ঐ সাধুপুরুষেরাই 'করা না করার ক্ষমতার' অধিকারী, সুতরাং তাদের উপাসনা করা কর্তব্য; আর কিছু লোকের ধারণা এই যে, ক্ষমতা ও অধিকার তো একমাত্র আল্লাহর, তবে এই মূর্তিগুলো যে সাধুপুরুষদের, আল্লাহর নিকট তাঁদের রয়েছে বিশেষ নৈকট্য এবং তাঁদের সুফারিশের রয়েছে বিরাট গুরুত্ব, তাই তাঁদের উপাসনা করা কর্তব্য, যেন তারা সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর নিকট সুফারিশ করে। তাদেরই সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ওরা যাদের পূজা করে তারা নিজেরাই তো আপন প্রতিপালকের দয়া ও করুণার প্রত্যাশী এবং তাঁর আযাবের ভয়ে কম্পমান। তো এরা তোমাদের সম্পর্কে কী সুফারিশ করবে!'

তো শিরক যে স্তরেরই হোক; চূড়ান্ত স্তরের, মধ্যস্তরের, বা লঘুস্তরের, আল্লাহর নিকট কোনভাবেই তা ক্ষমার যোগ্য নয়, বরং চিরস্থায়ী জাহান্নামই হলো তার প্রাপ্য।

তাওহীদের দাবী

প্রশ্ন হলো, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ বলে যে তাওহীদের আদেশ করা হয়েছে তা কোন্ স্তরের তাওহীদ? এবং বান্দার কাছে সেই তাওহীদের দাবী কী? উত্তর এই যে, তাওহীদ অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই, না উপকার করার, না ক্ষতি করার, না দান করার, না রোধ করার। সে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং ইবাদত ও উপাসনার যত প্রকার, পদ্ধতি এবং প্রকাশ ও অভিপ্রকাশ রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে, কোন গায়রুল্লাহর ক্ষেত্রে কোনভাবেই তা ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কাউকে (কোন জীবিত মানুষকে, কোন মূর্তিকে, কোন কবরকে বা কবরওয়ালাকে) সিজদা করা যাবে না, কারো নামে বলি বা কোরবানি করা যাবে না, কারো কাছে কোন প্রয়োজন প্রার্থনা করা যাবে না।)

আরেকটি বিষয়, ইবলিস আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করেনি, কিংবা নিজের জন্যও শরীকানা দাবী করেনি, সুতরাং ইবলিস মুশরিক নয়।

আল্লাহর যাত ও সত্তার একত্ব, তাঁর ছিফাত ও গুণাবলীর একত্ব সে স্বীকার করেছিলো; কারণ এ সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ ইলম ছিলো। আল্লাহর সঙ্গে সে কালাম করেছে, জান্নাত-জাহান্নাম দেখেছে। তবু ইবলিস মুমিন নয়। কারণ ঈমান ও তাওহীদের অনিবার্য দাবী হলো পূর্ণ আনুগত্য ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। ইবলিসের মধ্যে তাওহীদের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি ছিলো এবং আনুগত্যও ছিলো, কিন্তু পূর্ণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য ছিলো না। সে সবকিছু মানতে প্রস্তুত ছিলো, কিন্তু আদমকে সিজদা করার আদেশ মানতে প্রস্তুত ছিলো না। আর সবকিছু মানতে পারবে, কিন্তু সিজদার আদেশ মানতে পারবে না। এটা হলো কুফুর বা প্রত্যাখ্যান। শিরকের মত কুফুরও ঈমান ও তাওহীদের বিপরীত। ইবলিস, বিশ্বাস করেছিলো, আনুগত্যও করেছিলো, কিন্তু একটিমাত্র আদেশ, আদমকে সিজদা করার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

মোটকথা, তাওহীদ মানে আল্লাহর যাত ও সত্তার পূর্ণ একত্বের উপর ঈমান আনা, কোরআন শরীফে আল্লাহর যত ছিফাত ও গুণ বর্ণিত হয়েছে প্রতিটি গুণ ও ছিফাত আল্লাহর জন্য এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য একথা বিশ্বাস করতে হবে। কোন একটি গুণ ও ছিফাত যদি অস্বীকার করা হয়, কিংবা তাতে অন্য কোন সত্তার কিছুমাত্র শরীকানা আছে বলে বিশ্বাস করা হয় তাহলে সে কাফির বা মুশরিক হয়ে যাবে। তাকে তাওহীদে বিশ্বাসী মুমিন কিছুতেই বলা যাবে না।

তদ্রূপ এমন কোন গুণ ও ছিফাত তার প্রতি আরোপ করা যাবে না, যা কোরআনে বর্ণিত গুণ ও ছিফাতের বিপরীত। কোরআনে বলা হয়েছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

কোন কিছু তাঁর মত নয়। (শূরা, ৪২ঃ ১১)

সুতরাং তাঁর পবিত্র সত্তার উপর মাখলুকের কোন রূপ, আকার, আকৃতি আরোপ করা যাবে না। তিনি যাবতীয় রূপ, আকার-আকৃতি এবং স্থান-কালের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। কোরআন ও সুন্নায় আল্লাহ সম্পর্কে হাত, ছাক, চেহারা ইত্যাদি এবং আসীন হওয়া, হাস্য করা ইত্যাদি যেসব কথা এসেছে সে সম্পর্কে উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এর আসল হাকীকত আমাদের জানা নেই। আমরা সে অর্থেই এগুলো বিশ্বাস করি, যে অর্থ আল্লাহ তা'আলার ইলমে গায়বের মধ্যে রয়েছে।

আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু না কাউকে জন্মদান করেছেন, না কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। না আছে তাঁর কোন পিতা-মাতা, না কোন পুত্র বা কন্যাসন্তান। সর্বোপরি তাঁর কোন সমকক্ষ, সমতুল্য বা অংশীদার নেই। সূরাতুল ইখলাছকে সূরাতুত্-তাওহীদও বলা হয়। তাতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ : اللَّهُ الصَّمَدُ : لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ বে-নিয়ায। তিনি কাউকে জন্ম দান করেননি এবং তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।

শিরকের বিভিন্ন প্রকার

তাওহীদ ফিযযাত-এর বিপরীত হলো শিরক ফিযযাত, যার অর্থ হলো কোন না কোনভাবে একাধিক সত্তাকে আল্লাহ মনে করা এবং একাধিক সত্তার ইবাদত করা। সুরাতুল ইখলাছের শেষ আয়াতে এটাকেই রদ করে বলা হয়েছে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আরো ইরশাদ হয়েছে-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য ইলাহ থাকতো, অবশ্যই আসমান ও যমীন (-এর নেযাম-শৃঙ্খলা) বিনষ্ট হয়ে যেতো। সুতরাং রাব্বুল আরশ আল্লাহর পবিত্রতা, ঐসব বিষয় থেকে যা তারা বলে।
(আল-আম্বিয়া, ২১ঃ২২)

কারণ একাধিক সত্তার ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ভিন্নতা অনিবার্য। অথচ আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপনায় কোন বিচ্যুতি, কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি। সুতরাং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার শিরক হলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত ছিফাত ও গুণ কোন না কোন পর্যায়ে অন্য কোন সত্তার জন্য সাব্যস্ত করা।

সূরাতুল ফাতিহায় আল্লাহ তা'আলার প্রথম যে ছিফাত ও গুণ বলা হয়েছে তা হলো রুবুবিয়্যাত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর। রাব্ব মানে প্রতিপালক। অর্থাৎ প্রত্যেক মাখলুককে তিনি জীবন ধারণ করার এবং জীবন রক্ষা করার এবং জীবন যাপন করার জন্য নিজ নিজ উপযোগী ও প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ দান করেছেন। শুধু দান করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বা পরবর্তী দায়িত্ব অন্য কারো হাতে অর্পণ করেননি, বরং প্রতিনিয়ত তিনি প্রতিটি মাখলূকের এবং বিশেষত মানবজাতির প্রতিপালন করে চলেছেন। এই প্রতিপালন শুধু প্রাণীজগতের সঙ্গেই বিশিষ্ট নয়, বরং জড়জগত ও উদ্ভিদজগতসহ জানা অজানা সমগ্রসৃষ্টিজগতকেই তিনি আপন রুবুবিয়্যাত দ্বারা বেষ্টন করে আছেন।

সূরাতুল ফাতিহায় বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় গুণ হলো রহমত তথা দিয়া ও করুণা। মাখলুকের প্রতি তিনি অশেষ দয়াবান ও করুণাময়। মাখলুকের মধ্যে পরস্পর দয়া ও করুণার

যত প্রকাশ দেখা যায়, বিশেষ করে সন্তানের প্রতি মাতৃমমতা ও পিতৃস্নেহ, এগুলো তাঁর অশেষ দয়া ও করুণারই সামান্য ছায়ামাত্র।

সুরাতুল ফাতিহায় বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার তৃতীয় ছিফাত হলো বিচার-দিবসের একক মালিকানা ও অধিকার, তিনিই বিচারদিবসের অধিপতি।
তিনি নেক আমলের পুরুস্কার দেবেন এবং বদআমলের শাস্তিবিধান করবেন। সুতরাং হে আল্লাহ, আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, (অন্যকোন সত্তার ইবাদত করি না) এবং শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই, (অন্যকোন সত্তার কাছে সাহায্য চাই না)।

চতুর্থ ছিফাত হলো, তিনিই একমাত্র হেদায়াতদাতা, হুয়ালহাদী। 'আপনি আমাদের পরিচালিত করুন সত্য-সরল পথে।'

এমনকি স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হিদায়াতদানের অধিকারী নন, তিনি শুধু আল্লাহর আদেশে মানুষকে হেদায়াতের পথপ্রদর্শন করেন। হেদায়াতদান করার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّكَ لَا يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

আপনি তো যাকে ভালোবাসেন তাকে হেদায়াতদান করতে পারেন না, বরং আল্লাহ হেদায়াতদান করেন যাকে ইচ্ছা করেন। আর তিনিই অধিক অবগত হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে। (আল-কাছাছ, ২৮ঃ৫৬)

তদ্রূপ মানুষের কর্মফলরূপে শাস্তি ও পুরস্কারদানের ক্ষমতা ও অধিকারও একমাত্র তাঁর। অলী-কুতুব তো দূরের কথা, কোন নবী-রাসূলেরও বিচারদিবসের শাস্তি-পুরস্কারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা বা অধিকার নেই। নবী-রাসূলগণ তো সেদিন আল্লাহ তা'আলার মহাপ্রতাপ ও জালাল-এর কারণে নিজেদের সম্পর্কেই চিন্তিত থাকবেন। হাঁ, আমাদের পেয়ারা নবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাফা'আত বা সুফারিশ করার মর্যাদা দান করা হবে। এই শাফা'আতও তিনি করবেন আল্লাহর পক্ষ হতে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার পর। কোরআনের ইরশাদ-

من ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِه

কে সে যে তাঁর সমীপে সুফারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া?!
(আল-বাকারাহ, ২৪ঃ২৫৫)

ইবাদাত

قال الله تعالى:

وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমারই ইবাদত করার জন্য। (যারিয়াত: ৫১: ৫৬)

وقال تعالى : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

তুমি তোমার প্রতিপালকের 'ইবাদত করতে থাকো, তোমার কাছে মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসা পর্যন্ত। (আলহিজর: ১৫ : ৯৯)

***

قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: َ

اللَّهُمَّ أَعِيِّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সাহায্য করুন আপনার যিকির ও শোকরের বিষয়ে এবং আপনার উত্তম ইবাদতের বিষয়ে। (আবূ দাউদ, ১৫২২)

ইসলামের ইবাদতব্যবস্থা

তাওহীদ ও রিসালাত এবং তাকদীর ও মা'আদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ঈমান ও বিশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে একজন মানুষ যখন ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করে তখনই আসে ইবাদতের প্রশ্ন। আকায়েদের পর ইসলামী শরী'আতে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ বিষয় হচ্ছে

ইবাদত। বস্তুত ইবাদতই হচ্ছে মানবসৃষ্টির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। তাই আলকোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও ইনসানকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য। (যারিয়াত, ৫১:৫৬)

তো প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, ইবাদত কাকে বলে? ইসলামী শরী'আতে ইবাদতের সংজ্ঞা কী? ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইবাদতের যে সংজ্ঞা ও পরিচয় দিয়েছেন তাতে শব্দের কিছু পার্থক্য থাকলেও হাকীকত ও মর্মগত দিক থেকে তা এক ও অভিন্ন। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ তাওহীদ ও রিসালাত এবং তাকদীর ও মা'আদ যেমন ঈমান ও বিশ্বাসগত দিক থেকে ইসলামের মূল স্তম্ভ তেমনি ইবাদত হচ্ছে আমল ও কার্যগত দিক থেকে ইসলামের মূল স্তম্ভ। সুতরাং ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ইবাদতের সংজ্ঞা ও পরিচয়ের ক্ষেত্রেও মতপার্থক্যের কোন অবকাশ নেই। তো ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইবাদতের যে পরিচয় পেশ করেছেন তা মোটামুটি এই-

ইবাদত হচ্ছে এমন কতিপয় আমল যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার আযমত ও বড়ত্ব স্বীকার করে এবং নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা, অসহায়ত্ব
ও মুহতাজি প্রকাশ করে এবং আল্লাহ তা'আলার অসীম করুণা, দান ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে, সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বান্দা তার মুহব্বত ও ভালোবাসা প্রকাশ করে। আর যাবতীয় ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে শুধু এবং শুধু আল্লাহকে রাযী-খুশী করা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।

ইবাদতের যে পরিচয় উপরে তুলে ধরা হলো তা থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট ও সুসাব্যস্ত হয়ে গেছে। প্রথম কথা এই যে, ইবাদতের তরীকা ও পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা ও অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। যার ইবাদত করা হবে তিনিই শুধু অহি ও রিসালাতের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেবেন, কী কী ভাবে ও কোন্ কোন্ তরীকায় তাঁর ইবাদত করা হবে। যে ইবাদত করবে তার কাজ শুধু নির্ধারিত তরীকা ও পদ্ধতি পালন ও অনুসরণ করা; পদ্ধতি নির্বাচন ও নির্ধারণ করা তার কাজ নয়। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে-

مد وَمَا ءَاتَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আর রাসূল তোমাদের কাছে যা আনয়ন করেন তোমরা তাই গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যই আল্লাহ কঠিন আযাবদানকারী
(সূরাতুল হাশর, ৫৯:৭)

বলাবাহুল্য, এই একটি বিষয় যদি আমরা আত্মস্থ করতে পারি তাহলেই বিদ'আতের সমস্ত পথ নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায় এবং বিদ'আতের ভয়াবহ অভিশাপ ও বরবাদি থেকে চিরকালের জন্য উম্মত নাজাত পেয়ে যায়।

ইবাদত হতে হবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো সুন্নত তরীকায়, কমও না, বেশীও না। সুন্নাত থেকে বিচ্যুতির মানেই হলো বিদ'আত, আর ইবাদতের মধ্যে যখন বিদ'আত অনুপ্রবেশ করে তখন ইবাদত আর ইবাদত থাকে না, গোমরাহি ও বরবাদি হয়ে যায়। তাই আল্লাহর পেয়ারা হাবীব উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন-

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

বিদ'আতমাত্রই গোমরাহি, আর গোমরাহিমাত্রই জাহান্নাম-অভিমুখী।(সুনানে নাসাই,১৫৭৭)

দ্বিতীয়ত বান্দার যাবতীয় ইবাদত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, পৃথিবীর অন্যকোন শক্তির তাতে সামান্যতম শরীকানাও থাকতে পারবে না। ইরশাদ হয়েছে-

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
আর তোমরা ইবাদত করো আল্লাহর, দ্বীনকে তাঁর জন্য খালিছ করে; যদিও কাফিররা (তা) অপছন্দ করে (গাফির, ৪০: ১৪)

আল্লাহ তা'আলা এতই বে-নেয়ায, বে-মুহতাজ যে, বান্দার ইবাদতে অন্য কারো শরীকানার গন্ধও তিনি বরদাশত করতে প্রস্তুত নন। মানুষ নিজেও তো অন্যের শরিকানা বরদাশ করতে প্রস্তুত নয়, তাহলে আল্লাহর গায়রাত কীভাবে তা বরদাশত করতে পারে? তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ
بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ

আর আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে থাকে, আর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর জন্য, আর এটা আমাদের 'শরীক দেবতাদের' জন্য। তো যা তাদের শরীক দেবতাদের জন্য তা তো আল্লাহর কাছে পৌঁছয় না, আর যা আল্লাহর জন্য সেটাও তাদের শরীক দেবতাদের কাছেই পৌঁছয়। বড় নিকৃষ্ট যা তারা সিদ্ধান্ত করে।' (আল-আন'আম, ৬: ১৩৬)

তৃতীয়ত আমরা আল্লাহর ইবাদত করি শুধু এ জন্য নয় যে, আল্লাহ আমাদের খালিক, মালিক ও মনিব, আর আমরা আল্লাহর দাস ও বান্দা। আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু আবদিয়াত ও দাসত্বেরই নয়, বরং আমরা আল্লাহর ইবাদত করি এজন্যও যে, আমাদের প্রতি তিনি অতি দয়ালু ও করুণাশীল; তাঁর দয়া ও দান এবং নেয়ামত ও অনুগ্রহ অসীম। তিনি আমাদের ভালোবাসেন ও মুহব্বত করেন, আর আমাদের অন্তরেও রয়েছে মহান দাতার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মুহব্বত। তো আমাদের ইবাদত যেমন দাসত্বের প্রকাশ তেমনি তা কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসারও প্রকাশ।

ইবাদতের উপকারিতা

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এ ছাড়া ইবাদতের আসল স্বাদ ও শান্তি বান্দা কিছুতেই অর্জন করতে পারবে না। বিষয়টি হচ্ছে, ইবাদত আমরা কেন করি? কার প্রয়োজনে করি?

তাওহীদের যে ঈমান ও আকীদা আমরা গ্রহণ করেছি সেই ঈমান ও আকীদারই অবিচ্ছেদ্য অংশ এই যে, আল্লাহ তা'আলার যাত ও সত্তা হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্মুখাপেক্ষী। তাঁর গুণবাচক নাম হচ্ছে গনী ও ছামাদ। কোন বিষয়ে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সববিষয়ে সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দার ইবাদত বান্দেগীর মোটেই মুখাপেক্ষী নন। একটি হাদীছে কুদসির মযমূন হলো-

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষ যদি সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়ে যায় তাতে আল্লাহ তা'আলার বড়াই ও বড়ত্বে এবং জালাল ও প্রতাপে সামান্যতম বৃদ্ধি হবে না। আবার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষ যদি নিকৃষ্টতম স্তরের ফাসেক ও বদকার হয়ে যায় তাতেও আল্লাহ তা'আলার বড়াই ও বড়ত্বে এবং জালাল ও প্রতাপে সামান্যতম পরিমাণও ক্ষতি হবে না।

ইবাদতের যা কিছু লাভ ও প্রাপ্তি তা বান্দার নিজের। বান্দারই রূহানি ফায়দার জন্য এবং দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা
বান্দার জন্য ইবাদতের নেযাম ও ব্যবস্থা জারি করেছেন। বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদেরকে মানবসত্তার গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

কোরআনে তাখলীকে আদম, বা আদমসৃষ্টির বর্ণনামতে আল্লাহ তা'আলা যখন মানবসৃষ্টির ইচ্ছা করলেন তখন প্রথমে তিনি মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর দেহকাঠামো তৈরী করলেন। তারপর সেই তাতে তিনি আপন রূহ ফুঁকলেন। এভাবে দেহ ও আত্মা মিলেই পূর্ণ মানবসত্তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। তো মানব-দেহের সম্পর্ক হলো অধঃজগতের সঙ্গে। কারণ তা মাটি দ্বারা তৈরী, পক্ষান্তরে মানব-আত্মার সম্পর্ক হলো ঊর্ধ্বজগতের সঙ্গে এবং স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে। কারণ তা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে।

জড়জাগতিক দেহের জন্য প্রয়োজন তার উপযোগী খাদ্য। তাই আল্লাহ তা'আলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে অন্যান্য পশুর জন্য যেমন পৃথিবীতে বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন তেমনি মানুষের জন্যও বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। এদিক থেকে মানুষে ও পশুতে কোন পার্থক্য নেই। পশু যেমন যমিন থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে, মানুষও তেমনি যমিন থেকে দেহের খাদ্য গ্রহণ করে। (অবশ্য দয়াময় আল্লাহ বান্দার রিযিকের ক্ষেত্রে বড় যত্ন ও মমতা প্রকাশ করেছেন। ধান ও গম থেকে শুরু করে গাছের ফল ও নদীর মাছ প্রতিটি খাদ্যকে বিচিত্র সব আবরণ দ্বারা আবরিত করে বান্দার হাতে তুলে দিয়েছেন। একটি আনার ভেঙ্গে তার ভিতরে দেখুন, দানাগুলো কত সুন্দর করে থরে থরে সাজানো হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

কিন্তু মানুষ তো মানুষ হয়েছে এবং পশু থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আশরাফুল মাখলুকাত হয়েছে রূহ ও আত্মার কারণে। এই রূহ ও আত্মার কারণেই ঊর্ধ্বজগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক। সুতরাং ঊর্ধ্বজগতের সঙ্গে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মযবূত ও সুদৃঢ় তখনই হবে যখন রূহ ও আত্মা ঊর্ধ্বজগত থেকে নিয়মিত খাদ্য লাভ করে সজীব ও পরিপুষ্ট হবে। বলাবাহুল্য যে, ইবাদতই হলো মানুষের রূহ ও আত্মার উর্ধ্বজাগতিক বাদ্য।

মানুষের দেহ যেমন খাদ্য ছাড়া বাঁচে না এবং পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করে না তেমনি তার রূহ বা আত্মাও ইবাদতের রূহানি খাদ্য ছাড়া সজীবতা লাভ করে না। তো যমীন থেকে মানবদেহের জন্য বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেমন আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহ তেমনি মানবরূহের জন্য খাদ্য-রূপে বিভিন্ন ইবাদতের ব্যবস্থা করাও বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া ও ইহসান। এটা হচ্ছে তাঁর বুবুবিয়াতের জাগতিক ও ঊর্ধ্ব-জাগতিক প্রকাশ।

ইবাদতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে নিকটতর হতে থাকে এবং যমীনের বুকে আল্লাহর খলীফা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে, আর আখেরাতের অনন্ত জীবনে জান্নাতের অধিকারী হতে পারে।

ইবাদতের চার প্রকার

ইবাদত সম্পর্কে উপরে যে মৌলিক আলোচনা করা হলো তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার পর আমরা ইবাদতের প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর চারপ্রকার ইবাদত ফরয করেছেন, যথা- ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্ব। ঈমান হচ্ছে

ইসলামের প্রথম ও প্রধান রোকন, আর চারপ্রকার ইবাদত হচ্ছে ইসলামের চাররোকন। তাই হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে-

بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةِ والحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
اللفظ لمسلم، ولفظ البخاري : وأن محمدا رسول الله

ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে পাঁচটি জিনিসের উপর। (প্রথমত) একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া নেই কোন ইলাহ এবং মুহম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। আর (দ্বিতীয়ত) ছালাত আদায় করা, আর (তৃতীয়ত) যাকাত প্রদান করা আর (চতুর্থত) হজ্ব সমাধা করা, আর (পঞ্চমত) রামাযানের ছিয়াম পালন করা। (বুখারী-০৮,মুসলিম-১৬)

ইসলামে মু'আমালাহ ও মু'আশারাহ

قال الله تعالى:
يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের মাল আত্মসাৎ করোনা। (নিসা: ৪: ২৮)

***

قال رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم:
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে আমাদের ধোকা দেয় সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। (মুসলিম, ১০১)

মু'আমালা ও মু'আশারা-এর গুরুত্ব

ঈমান হচ্ছে ইসলামের মূল স্তম্ভ। তারপর ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্ব হচ্ছে ইসলামের চার রোকন; এগুলোর সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার। ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অর্থাৎ বান্দা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তাঁর যাবতীয় ছিফাত ও গুণাবলী স্বীকার করে। ব্যাপক অর্থে বান্দা আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তাই এগুলো হচ্ছে حقوق الله তো এতক্ষণ আমাদের আলোচনা ছিলো হুকুকুল্লাহ সম্পর্কে।

পৃথিবীতে মানুষের জীবন হচ্ছে সামাজিক জীবন। কোন মানুষের পক্ষে একা জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। মানবশিশু দুনিয়াতে আসার আগেই যার মায়া-মমতা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ সে গ্রহণ করে এবং যার অপরিসীম কষ্ট স্বীকারের ফলেই সে পৃথিবীর মুখ দেখতে পায় তার নাম 'মা'; যার দীর্ঘ প্রতিপালনের মাধ্যমে সে বড় হতে থাকে তিনি তার 'মা'। এসকল কষ্ট স্বীকার করার ক্ষেত্রে মাকে পূর্ণ সঙ্গ ও সহায়তা দান করেন শিশুর বাবা। এভাবে মা ও বাবার বিরাট ইহসান ও অনুগ্রহ দ্বারাই সে দুনিয়াতে আসে এবং বড় হয়। তারপর আছে ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য। এভাবে জন্মসূত্রেই আমরা বিরাট একটা পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাই। তারপর আসে বিভিন্ন সামাজিক বন্ধন। এসকল বন্ধন দ্বারা জীবনের চলার পথে আমরা অনেক উপকৃত হই। ফলে অনিবার্যভাবেই পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের কিছু দায়দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়।

এগুলোকে বলা হয় حقوق العباد বা বান্দার প্রতি বান্দার হক।

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাই হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক সম্পর্কেও রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান, যা পালন করার মাধ্যমেই পূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে হুকুকুল্লাহর গুরুত্ব যেমন বিরাট তেমনি হুকুকুল ইবাদের গুরুত্বও অনেক। বরং এদিক থেকে হুকুকুল ইবাদের আলাদা গুরুত্ব এই যে, আল্লাহ তাঁর নিজের হক যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন, কিন্তু বান্দার হক যদি বান্দা নিজে মাফ না করে, আল্লাহ তা মাফ করেন না। বান্দা নিজে মাফ করলেই শুধু মাফ হতে পারে।

একটি হাদীছের মযমূন এই যে, বান্দা ছালাত, ছিয়াম ও ছাদাকা ইত্যাদি বহু নেক আমল নিয়ে হাশরের ময়দানে হাযির হবে, অর্থাৎ হুকুকুল্লাহ সে ঠিকঠাক আদায় করেছে, কিন্তু তার

মু'আমালা-মু'আশারা ঠিক ছিলো না। কারো হক মেরেছে, আমানতের খেয়ানত করেছে, কারো মনে কষ্ট দিয়েছে, কারো গীবত করেছে, ইত্যাদি। ফলে বহু মানুষ তার বিরুদ্ধে হকের দাবি নিয়ে দাঁড়াবে, আর আল্লাহ তা'আলা ইনছাফ করবেন এবং তার ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি নেক আমলগুলো হকদারদের দিতে থাকবেন। যখন আর কোন নেক আমল বাকি থাকবে না তখন হকদারদের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। এভাবে সে গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে জাহান্নামের দিকে রওয়ানা হবে।(মুসলিম-২৫৮১)

আফসোস, বহু দ্বীনদার মানুষ ছালাত-ছিয়ামের তো অনেক পাবন্দি করে, এমনকি বছরের পর বছর নফল হজ্ব করে, কিন্তু মু'আমালা-মু'আশারার কোন ফিকির করে না, লেনদেনে হালাল-হারামের চিন্তা করে না, বান্দার হক দিন-রাত নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তার পরোয়া করে না। তো উপরের হাদীছ অনুযায়ী খুবই আশঙ্কা আছে যে, কেয়ামতের দিন অনেক আমল নিয়ে হাযির হওয়া সত্ত্বেও বান্দার হক আদায় না করার কারণে তারা কাঙ্গাল হয়ে গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে জাহান্নামে যাবে। সুতরাং ইবাদতের যেমন ইহতিমাম করা কর্তব্য তেমনি কর্তব্য হলো মু'আমালা-মু'আশারা বা বান্দার হক আদায়ের ফিকির করা। এখন এ সম্পর্কেই কিছু আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

মু'আমালা একটি আরবী শব্দ, তবে মুসলিম সমাজে খুব পরিচিত ও প্রচলিত শব্দ, যার মোটামুটি অর্থ হলো দুই বা আরো বেশী মানুষের মধ্যে যে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন, যথা ক্রয়-বিক্রয়, শ্রম ও মজুরি বিনিময়,
ভাড়া ও ইজারা, করয ও আমানত, মামলা-মোকদ্দমা, বিচার-আচার ও সাক্ষ্যপ্রদান ইত্যাদি। তো মু'আমালার ক্ষেত্রেও ইসলামী শরী'আতের সুনির্দিষ্ট আহকাম ও বিধিবিধান রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বান্দাদের প্রতিটি মু'আমালা যেন সততা ও সত্যবাদিতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়; উভয়পক্ষ যেন লাভবান হয়; কেউ যেন কারো হক নষ্ট না করে। প্রত্যেকে যেন অপরের হক পূর্ণরূপে আদায় করে; কেউ যেন কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতারিত না হয়। এভাবে মুসলিম সমাজ যেন শান্তির সমাজে পরিণত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে তাকেই বলা হবে কামিল ও পূর্ণ মুমিন যার মু'আমালা হবে দ্বীন ও শরী'আতের পূর্ণ অনুগত। পক্ষান্তরে কেউ যদি ছালাত-ছিয়াম তো পালন করে, এমনকি নফল ইবাদতও যথেষ্ট করে, কিন্তু মু'আমালার ক্ষেত্রে শরী'আতের আহকাম পালন করে না, যেমন মাপে কম দেয়, জাল করে, ভেজাল মেশায়, ওয়াদাভঙ্গ করে, মিথ্যা বলে, আমানতের খেয়ানত করে, মিথ্যা মামলা দ্বারা হয়রানি করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। সুদ-ঘুষ ও হারামের মাল ঘরে

আনে, সে কিছুতেই খাঁটি মুমিন নয়, বরং মুনাফিক ও ফাসিক-ফাজির। যার মু'আমালা খারাপ তার জন্য কোরআন-সুন্নায় এমন সব কঠিন আযাবের হুঁশিয়ারি এসেছে যা শুনলে শরীর কাঁটা দেয় এবং বুক কেঁপে ওঠে।

উত্তম চরিত্র

قال الله تعالى:
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

আর নিঃসন্দেহে আপনি রয়েছেন মহান চরিত্রের উপর (আকলম: ৬৮: ৪)

***

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে মহোত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্য।
(সুনানে কোবরা, বায়হাকী, ১০/১৯১)

ইসলামে আখলাক ও চরিত্রের গুরুত্ব

দ্বীন ও শরী'আতে ইবাদতের গুরুত্ব কী পরিমাণ তা তো আমরা জানি। মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যই বলা হয়েছে ইবাদতকে। তবে ইবাদতের মত হুসনে আখলাক বা উত্তম চরিত্রেরও বিরাট গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। প্রকৃতপক্ষে মু'আমালা ও মু'আশারাহ নামে যা কিছু বলা হয় বৃহৎ অর্থে সেগুলো উত্তম চরিত্রেরই বিভিন্ন দিক। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বলা যায়, দ্বীনের প্রধান বিষয় মূলত তিনটি; ঈমান, ইবাদাত ও আখলাক।

যারা অন্তজ্ঞানী তারা বলেছেন, ইবাদতের মাধ্যমে আমরা বান্দেগি তথা বিনয় ও দাসত্ব প্রকাশ করি, কিন্তু উত্তম চরিত্র দ্বারা আমরা বান্দার ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে সামান্যমাত্র হলেও আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ করি, অর্থাৎ আল্লাহ যা করেন আল্লাহর আদেশে বান্দাও তার ক্ষুদ্র অবস্থান থেকে তাই করে। ইবাদতের ক্ষেত্রে কিন্তু একথা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহর একটি ছিফাত হলো রহমত। তিনি রহীম। তো বান্দাকে আদেশ করা হয়েছে রহমত ও দয়াগুণটি অর্জন করার। সুতরাং বান্দা যখন কারো প্রতি দয়া করে তখন বলা হয়, লোকটি বড় رحيم অর্থাৎ রহমত ও দয়াগুণের ক্ষেত্রে বান্দা অতি ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে হলেও আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে। একারণেই উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বলা হয় هو التخلق بأخلاق الله অর্থাৎ উত্তম চরিত্র আর কিছু নয়, শুধু আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার চেষ্টা করা।

সুতরাং এদিক থেকে মাকারেমে আখলাক বা উত্তম চরিত্রের রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত বোঝার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে তাঁর বি'ছাত বা আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন-

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে মহোত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্য।

তো যে বিষয়টি নবুয়ত ও বি'ছাত-এর উদ্দেশ্যভুক্ত তার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে তো সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

আর নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।
(আলকলম: ৬৮: ৪)

মোটকথা, মানবচরিত্রে যত উত্তম বিষয় রয়েছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে তা সর্বোত্তম পর্যায়ে বিদ্যমান ছিলো। সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে তিনি ছিলেন মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী। হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিলো? তিনি লম্বা বয়ান পরিহার করে একটি কথাই বলেছিলেন-

كانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ

কোরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র।(মুসনাদে আহমাদ-২৪৭৭৩)

তো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'কোরআনি চরিত্র'র বিশদ বর্ণনা সীরাতের কিতাবে রয়েছে, যা সংক্ষেপে বয়ান করতে গেলেও বিরাট দফতর হয়ে যাবে। যার শওক আছে সে যেন সীরাতের কিতাব থেকে জেনে নেয়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا

ঈমানের দিক থেকে সবচে' পরিপূর্ণ মুমিন হলো যে চরিত্রের দিক থেকে সবচে' উত্তম।(আবু দাউদ-৪৬৮২)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

ما مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَومَ القِيامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ

কেয়ামতের দিন মুমিনের (আমলের) মীযানে উত্তম চরিত্রের চেয়ে ওযনদার কোন কিছু হবে না।(তিরমীযী-২০০২)

একটি হাদীছের মযমূন এই, যার আখলাক উত্তম, আর সে ফরয ঠিকমত আদায় করে, কিন্তু নফল তেমন করে না বা করতে পারে না, তার উত্তম আখলাকের কারণে আল্লাহ তা'আলা

তাকে ঐ লোকদের সমান ছাওয়াব দান করবেন যারা দিনে ছিয়াম রাখে, আর রাত জেগে নফল ছালাত পড়ে।(তিরমীযী-২০০৩)

একবার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ছিফাত ও গুণ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়? তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় এবং উত্তম আখলাক। (তিরমীযী-২০০৪)

মন্দ আখলাক সম্পর্কে হুঁশিয়ারি

প্রতিটি উত্তম আখলাকের বিপরীতে যা রয়েছে সেটাই হলো মন্দ চরিত্র বা আখলাকে রাযীলাহ। তো শরী'আত যেমন আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র অর্জনের তাকীদ করেছে তেমনি আখলাকে রাযীলাহ বা মন্দ চরিত্র থেকেও বেঁচে থাকার তাকীদ করেছে এবং মন্দ চরিত্রের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি প্রদান করেছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মন্দ আখলাক ও খারাপ চরিত্রের মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না।'(বুখারী-৪৯১৮)

আরেকটি হাদীছের মযমূন হলো, সব গোনাহেরই তাওবা রয়েছে, কিন্তু যার আখলাক মন্দ সে কোন গোনাহ থেকে তাওবা করতে না করতে আরো নিকৃষ্ট গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

ইসলাম ইলম ও জ্ঞানসাধনার ধর্ম

নির্জন হেরাগুহায় আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আসমান থেকে প্রথম যে অহী নাযিল হয় তা হলো-

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَم
يَعْلَم

(হে মুহাম্মাদ), পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আটকে থাকা রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার প্রতিপালক সর্বমহান, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (সূরাতুল-'আলাক, ৯৬: ১-৫)

পৃথিবীর সকল ধর্ম ও সভ্যতার জন্য এটা ছিলো এক বড় বিস্ময় যে, এক নির্জন পর্বতগুহায় আরবের এক উম্মি মানুষের উপর, যার বর্ণপরিচয় পর্যন্ত নেই এবং যিনি কলম কীভাবে ধরতে হয় জানেন না, তাঁর উপর অবতীর্ণ প্রথম অহী শুরুই হয়েছে 'পড়ো' শব্দটি দিয়ে। 'পড়ো' দ্বারা অহীর উদ্বোধন একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, এই উম্মি নবীর উম্মত হবে ইলমী উম্মত, জ্ঞানসাধনার উম্মত; তিনি যে যুগের নবী সেটা হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যুগ, উন্নতি-অগ্রগতি ও বিনির্মাণের যুগ; এ যুগে যারা পড়বে তারা হবে প্রাগ্রসর, যারা পড়বে না তারা হবে পশ্চাৎপদ।

'পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। প্রথম অহীর মধ্যেই মানবজাতিকে ইলমের প্রকৃতি, পরিচয় ও হাকীকত শিক্ষা দেয়া হলো যে, ইলম তখনই হবে কল্যাণপূর্ণ যখন তা অর্জন করা হবে পরম প্রতিপালকের নামে, কারণ তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; জ্ঞানেরও স্রষ্টা, জ্ঞান অর্জনকারী মানুষেরও স্রষ্টা। সুতরাং জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে স্রষ্টার সন্তুষ্টিবিধান এবং সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণসাধন। সেই জ্ঞান জ্ঞানই নয়, যেখানে স্রষ্টার স্মরণ নেই, স্রষ্টার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নেই; সেই জ্ঞান জ্ঞানই নয় যেখানে সৃষ্টির মঙ্গলেচ্ছা নেই, আছে শুধু সম্পদলিপ্সা, বা আধিপত্য অর্জনের উন্মাদনা।

'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে'। সুবহানাল্লাহ! কী প্রয়োজন

ছিলো প্রথম অহীর মধ্যে 'খালাকাল-ইনসানা মিন আলাক'-এর?! এখানে রয়েছে জ্ঞানের বৈচিত্র্যের প্রতি ইঙ্গিত। সব ইলমই তোমাকে অর্জন করতে হবে, তবে স্রষ্টার অনুগত হয়ে এবং সৃষ্টির সেবক হয়ে।

'পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক সর্বমহান'। তুমি যদি তার সন্তুষ্টির পথে চলো তাহলে জ্ঞানের পথে, কল্যাণের পথে তিনি তোমাকে অবশ্যই পরিচালিত করবেন। কারণ তিনি তোমার প্রতিপালক; তিনি তোমার দুর্বলতা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবগত, আর তিনি সর্বমহান। মহত্ত্বের কারণেই তিনি তোমাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন।

'যিনি শিক্ষা দান করেছেন কলম দ্বারা'। কলমের জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কী হতে পারে যে, সারা মক্কা তালাশ করেও হয়ত দু'চারটি কলম পাওয়া যাবে না, এমন পরিবেশে প্রথম অহী অবতরণের সময় কলমকে স্মরণ করা হয়েছে এবং ইলমের মাধ্যমরূপে তার অনন্য মর্যাদার
স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। সুতরাং কলমের মর্যাদা রক্ষা করা তো প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টারই মর্যাদা রক্ষা করা, স্রষ্টার মনোনীত ধর্ম ইসলামেরই মর্যাদা রক্ষা করা।

কত মর্মান্তিক পরিহাসের বিষয়, যে অহীর সূচনা হলো 'পড়ো' দিয়ে, 'আল্লামা বিল-কলম দিয়ে' সেই ইসলামকে আজ আসামীর কাঠগড়ায়
দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে হচ্ছে যে, ইসলাম ইলমের দুশমন নয় এবং জ্ঞানসাধনার প্রতিপক্ষ নয়। ইসলাম তো শুরু থেকেই পড়তে বলে, শিখতে বলে, কলম ব্যবহার করতে বলে। ইসলাম তো ইলমের পথপ্রদর্শক, ইসলাম তো জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। মানবসম্প্রদায়ের কাছে ইসলাম শুধু চায় ইলমের মানলি যেন ঠিক থাকে, জ্ঞানের লক্ষ্য যেন নির্ভুল থাকে। জ্ঞান যিনি সৃষ্টি করেছেন, জ্ঞানসাধনার সম্পর্ক যেন তাঁর সঙ্গে অটুট থাকে। তাহলেই জ্ঞান হবে কল্যাণের আধার, অন্যথায় তোমার জ্ঞানই হবে তোমার ধ্বংসের কারণ।

মানবসভ্যতার বড় দুর্ভাগ্য এই যে, ইউরোপে যখন বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় তখন সেখানে ধর্মের প্রতিনিধিরূপে বিদ্যমান ছিলো ইসলাম নয়, খৃস্টধর্ম, যা ছিলো মূলত সাধু পৌলের হাতে বিকৃতিপ্রাপ্ত। বিজ্ঞান যত অগ্রসর হতে লাগলো খৃস্টধর্মের সঙ্গে, আরো সঠিক অর্থে, পৌলবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের বাদানুবাদ শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত যা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সঙ্ঘর্ষে পরিণত হলো। শেষ পর্যন্ত ধর্মমাত্রকেই বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ ও শত্রু বলে ধরে নেয়া হলো। যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির বন্দনায় যাদের দিনরাত এক হলো তাদের এতটুকু বুদ্ধি হলো না যে,

খৃস্টধর্মই তো একমাত্র ধর্ম নয়, আরো তো ধর্ম আছে! বিজ্ঞানের প্রথম সবক যাদের কাছ থেকে প্রথম পেয়েছি সেই মুসলিমদেরও তো একটি ধর্ম রয়েছে। ইসলাম কী বলে একটু তো খুঁজে দেখি!

আরো দুর্ভাগ্য, মুসলিম উম্মাহ তখন এমই বেঘোর ছিলো যে, বিজ্ঞানের উন্মাদনায় আত্মহারা ইউরোপের সামনে ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা তারা তুলে ধরতে পারেনি। সেটা তো দূরের কথা, তারা নিজেরাই তখন ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো। ওলামায়ে উম্মত তখন উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাই ইসলামের এত বড় একটি বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় সভ্যতার বিনির্মাতাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে গিয়েছিলো।

ইসলাম জীবন-পরিবেষ্টক ধর্ম

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম প্রকৃত অর্থেই নিছক ধর্ম, যা কতিপয় অস্পষ্ট বিশ্বাস, উপাসনা, আচরণ ও সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ; জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে
যার কোন ভূমিকা নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম প্রচলিত অর্থে নিছক একটি ধর্ম নয়। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তার ইবাদতব্যবস্থাও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত, যার উৎস কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুসিদ্ধ। তবে ইসলামের পরিধি শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের মধ্যেই সীমাবন্ধ নয়, বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে তা পরিবেষ্টন করেছে এবং জীবনের প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে তার নিজস্ব বিধান ও ব্যবস্থা। এককথায় ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ শরী'আতভিত্তিক দ্বীন। সুতরাং জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোন অজুহাতেই শরী'আতের বিধান এড়িয়ে নতুন কোন আইন ও বিধান প্রণয়নের অধিকার কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠন, সমাজপতি, এমনকি রাষ্ট্রেরও নেই। কেউ যদি তা করতে চায়, হোক তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইন পরিষদ, তাহলে সেটা হবে শরী'আতের বিধানে হস্তক্ষেপের শামিল, যা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই নামান্তর।

অবশ্য শরী'আতের নির্ধারিত গণ্ডির ভিতরে থেকে সুনির্দিষ্ট মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে আধুনিক সমস্যার সমাধান বের করার ব্যবস্থা স্বয়ং শরী'আতের মধ্যেই রয়েছে, শরী'আতের পরিভাষায় যাকে বলা হয় ইজতিহাদ। এটা ছাহাবা কেরামের যামানা থেকেই চলে আসছে এবং আখেরি যামান পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। এটাও ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যা আর কোন ধর্মে নেই।

এ বিষয়ে বুনিয়াদি কথা এই যে, যে সকল বিষয় কোরআনে বা সুন্নায় সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রয়েছে সে সম্পর্কে কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদ বা নিজস্ব চিন্তা প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে কিছু বিষয় এমন

রয়েছে যার প্রত্যক্ষ বিধান কোরআন-সুন্নায় বর্ণিত হয়নি; আবার সময়ের পরিবর্তন এবং নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এমন সমস্যারও উদ্ভব হয় যার জন্য স্বতন্ত্র বিধান শরী'আতে বিদ্যমান নেই সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ কোরআন ও সুন্নাহর নির্ধারিত উছুল ও মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ ও আইনি চিন্তাপ্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত আহরণ করেন, যা

শরী'আতেরই বিধান এবং উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত বিধান বলে গণ্য হয়। এ সম্পর্কে দিকনির্দেশক একটি হাদীছ এই-

إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَن فقال : كيف تقضي ؟ فقال : أَقْضِي بما في كِتَابِ اللهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتابِ اللهِ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : فإن لم يكن في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رأْيِي . قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسولَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم (رواه الترمذي، رقم الحديث : ١٣٢٧، ورواه أبو دود، رقم الحديث : ٣٥٩٢، واللفظ للترمذي(

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয বিন জাবাল রা.কে যখন প্রশাসক নিযুক্ত করে ইয়ামান পাঠালেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কীভাবে ফায়ছালা করবে? তিনি বললেন, আমি কিতাবুল্লাহর ভিত্তিতে ফায়ছালা করবো। তিনি বললেন, যদি কিতাবুল্লাহ-এ (সিদ্ধান্ত) না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী (ফায়ছালা করবো।) তিনি বললেন, যদি সুন্নায় না থাকে? তিনি বললেন, (তাহলে) আমি আমার চিন্তা দ্বারা ইজতিহাদ করবো। তিনি বললেন, আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে তাওফীক দান করেছেন।(তিরমীযী-১৩২৭,আবুদাউদ-৩৫৯২)

ছাহাবা কেরামের জামা'আতে যারা ইজতিহাদি যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন। ছাহাবা কেরামের তারবিয়াত ও তত্ত্বাবধানে যে সকল তাবেঈ ইজতিহাদের মাকাম হাছিল করেছেন তাঁরাও সময়ের প্রয়োজনে ইজতিহাদ করেছেন। পরবর্তীকালেও এ ধারা অব্যাহত ছিলো এবং ইতিহাসে বহু বরেণ্য ইমাম ও মুজতাহিদ আবির্ভূত হয়েছেন, যাদের বিস্ময়কর ইজতিহাদি সাধনার ফসলরূপে সুসমৃদ্ধ ইসলামী ফিকাহ ও আইনশাস্ত্র আত্মপ্রকাশ করেছে।

তবে মনে রাখতে হবে, শরী'আতে ইজতিহাদ এমনই মহাগুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় যে, যে কারো ইজতিহাদ করার অধিকার নেই। ছাহাবা কেরামের মধ্যে যারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবাত, তারবিয়াত ও তা'লীমের মাধ্যমে জ্ঞান ও অন্তর্জানের সর্বোচ্চ মাকাম অর্জন করেছিলেন তাঁরাই শুধু ইজতিহাদ করেছেন। আবার যে সকল তাবেঈ ছাহাবা কেরামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দ্বীনের সগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করেছিলেন তাঁদেরই শুধু অধিকার ছিলো ইজতিহাদ করার। তো তা'লীম ও তারবিয়াতের এই সনদ-ধারায় যারা অন্তর্ভুক্ত, শরী'আত সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও অন্তজ্ঞান এবং যাদের তাকওয়া ও ধার্মিকতা সর্বস্বীকৃত তাদেরই শুধু ইজতিহাদের অধিকার রয়েছে।

আল্লাহ-প্রদত্ত অহীর ইলমের কারণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয়ে জানা ছিলো যে, আখেরি যামানায় তাঁর উম্মতের মধ্যে ইলমের দাবিদার কিছু 'মূর্খ' লোকের আগমন ঘটবে যারা নিজেদের মনে করবে সুবিজ্ঞ মুজতাহিদ। অথচ ইজতিহাদের ন্যূনতম যোগ্যতাও তাদের মধ্যে থাকবে না, কিন্তু তারা ইজতিহাদের নামে দ্বীন ও শরী'আতের মধ্যে অনাচার সৃষ্টি করবে, তাই তিনি তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী রেখে গেছেন; ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لا يَنزِعُ العِلْمَ بَعدَ أَنْ أَعطاهُمُوهُ أنتِزَاعًا، ولكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسُ جُهَّالُ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِم فَيَضِلُّونَ
ويُضِلُّونَ رواه البخاري رقم ٧٣٠٧؛ ورواه مسلم، رقم٢٦٧٣

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ মানুষকে এই ইলম দান করার পর তা হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেবেন না, তবে তিনি তা তাদের থেকে তুলে নেবেন, আলিমদেরকে তাদের ইলমসহ কব্য করার মাধ্যমে। ফলে এমন মূর্খ লোকেরাই শুধু থেকে যাবে যাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করাহবে, আর তারা ফতোয়া দেবে নিজেদের চিন্তা থেকে; ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং মানুষকেও গোমরাহকরবে। (বুখারী-৭৩০৭,মুসলিম-২৬৭৩)

এ প্রসঙ্গে সর্বজনশ্রদ্ধেয় তাবেঈ হযরত মুহম্মদ বিন সীরীন রহ. বলেছেন-

فانظروا عمن تأخذون هذا الدين

সুতরাং তোমরা দেখো, কার কাছ থেকে এ দ্বীন তোমরা গ্রহণ করছো।(মুসলিম)

তাহারাত ও পবিত্রতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট হলো ইবাদতের জন্য তার নির্ধারিত তাহারাতব্যবস্থা, যার ন্যূনতম নযীর অন্যকোন ধর্মব্যবস্থায় নেই। তাহারাতের বিষয়ে যারা অধিক যত্নবান তাদের প্রশংসা করে ইরশাদ হয়েছে-

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين

তাতে (মসজিদে কোবার নিকটে) বাস করে এমন কতিপয় লোক যারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে ভালোবাসে, আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। (তাওবাহ, ৯:১০৮)

স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে-

يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

হে চাদরাবৃত, উঠুন এবং সতর্ক করুন, আর আপনার প্রতিপালকের বড়ত্ব বর্ণনা করুন, আর আপনার বস্ত্রাদি পবিত্র করুন।
(সূরাতুল-মুদ্দাছছির, ৭৪: ১-৪)

একই ভাবে বাইতুল্লাহ নির্মাণকারী হযরত ইবরাহীম আ.কে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করছেন-
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود

আর ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি ইবরাহীমকে কা'বাঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিলাম, (আর বললাম) যে, তুমি আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করো না, আর আমার ঘরকে পবিত্র করো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করবে এবং (ছালাতে) দাঁড়াবে এবং রুকু-সিজদা করবে।

(সূরাতুল হজ্ব, ২২:২৬)

আসমান থেকে নাযিল করা পানি সম্পর্কে বলা হয়েছে-
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ

আর নাযিল করেন তিনি তোমাদের উপর আসমান হতে পানি, যেন পাক

করেন তোমাদেরকে তা দ্বারা। (আল-আনফাল, ৯:১১)

এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার এখানে অবকাশ নেই; তবে মনে রাখা দরকার যে, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এক বিষয় নয়। পরিচ্ছন্নতার অর্থ হলো শরীরে বা কাপড়ে ময়লা না থাকা; আর পবিত্রতা বা তাহারাতের অর্থ হলো শরীর, কাপড় ও স্থান-এর এমন অবস্থা হওয়া যাতে ইবাদত সম্পন্ন করা যায়। অর্থাৎ রক্ত, মল-মূত্র ও অন্যান্য জিনিস থেকে মুক্ত হওয়া যেগুলোকে শরী'আত নাপাক সাব্বস্ত করেছে। তাছাড়া তাহারাত নষ্ট হওয়ার যে কারণ শরী'আত বর্ণনা করেছে তা দেখা দিলে শরী'আত-বর্ণিত নিয়ম তথা অযু বা গোসলের মাধ্যমে তাহারাত অর্জন করতে হয়। বস্তুত ইসলামের তাহারাতব্যবস্থা এমনই বাহ্যিক ও আত্মিক কল্যাণসম্পন্ন যে, অমুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিগণও এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন।

হারাম-হালালভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থা

ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, পানাহারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পশু-পাখীর গোশত আহার করার ক্ষেত্রেও রয়েছে তার স্বতন্ত্রব্যবস্থা। কারণ পানাহার মূলত জড়দেহের প্রয়োজনে গ্রহণ করা হলেও দেহ ও আত্মা উভয়ের ক্ষেত্রেই রয়েছে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ইসলামী শরী'আত যাবতীয় খাদ্যকে খাবীছ ও তাইয়েব (পবিত্র ও অপবিত্র) এ দু'ভাগে ভাগ করেছে। যা তাইয়েব তা হালাল, আর যা খাবীছ তা হারাম। ইরশাদ হয়েছে-

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيٰتَ

তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল সাব্যস্ত করেন, আর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম সাব্বস্ত করেন। (আলআ'রাফ, ৭: ১৫৬)

খাবাইছ বা হারাম খাদ্য কয়েকপ্রকার। প্রথমত এমন সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হারাম যাতে, ইসলামের দৃষ্টিতে নাপাক এমন কোন বস্তুর মিশ্রণ রয়েছে। দ্বিতীয়ত সাধারণভাবে যেসকল পশু-পাখী হিংস্র ও শিকারী তা হারাম, আর শূকর ও কুকুর কোন অবস্থায় হালাল নয়।

তৃতীয়ত যে সকল পশু-পাখী হালাল, কিন্তু শরী'আতসম্মতরূপে যবেহ করা হয়নি, তার গোশত খাওয়া হালাল নয়। যেমন যবেহ করা হলো, কিন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হলো না, কিংবা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হলো, হোক কোন দেব-দেবী ও মূর্তির নামে, কিংবা কোন পীর-কুতুব ও মাযারের নামে সেগুলোও মুরদারের শামিল, কোন-ভাবেই তা হালাল নয়। ইরশাদ হয়েছে-

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, আহার করো তোমরা ঐ উত্তম বস্তু-সমূহ হতে যা আমি রিযিকরূপে দান করেছি তোমাদের, আর শোকর করো তোমরা আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করতে চাও
(আলবাকারহ, ২: ১৭২)

পরবর্তী আয়াতেই নির্দিষ্ট কিছু বস্তু উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيم ُ

নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃতপ্রাণী এবং রক্ত এবং শূকরের গোশত এবং ঐ সমস্ত প্রাণী যা যবেহ করা হয়েছে গায়রুল্লাহর নামে। হাঁ, যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে যায়, না স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, আর না স্বীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে, তাহলে তার ক্ষেত্রে (তা ভক্ষণ করায়) কোন পাপ নেই। অবশ্যই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
(আল-বাকারাহ, ২:১৭৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

আর আহার করো না তোমরা ঐ পশু হতে যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, আর তা আহার করা জঘণ্য পাপ। (আলআন'আম, ৬: ১২১)

যারা সত্যিকারের মুসলিম, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তারা পৃথিবীর যেখানে যায়, যেখানেই থাকে, যত প্রতিকূলতারই সম্মুখীন হোক না কেন, পানাহারের ক্ষেত্রে তারা হালাল-হারামের পার্থক্য কঠোরভাবে পালন করে থাকে। এখন তো এমনকি অমুসলিমরাও হালাল খাদ্যের কল্যাণ ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছেন। ফলে ইউরোপে এখন হালাল খাদ্যের বাণিজ্য ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে ভক্তি-মুহব্বতের সম্পর্ক

যে কোন ধর্মগ্রন্থের অনুসারী তার ধর্মগ্রন্থের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তাদের আসমানি কিতাব আলকোরআনের সঙ্গে যে ভক্তি-মুহব্বতের পরিচয় দিয়ে থাকে তার কোন তুলনাই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথমত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون َ

এটাকে স্পর্শ করতে পারে না অতি পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া অন্য কেউ।
(আলওয়াকি'আহ, ৫৬:৭৯)

মুফাস্সিরীনে কেরাম লিখেছেন, এখানে যদিও ফিরেশতাদের কথা বলা হয়েছে যে, কোরআন লাওহে মাহফুযে এমনই সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে যে, ইবলীস ও তার অনুগামীদের ঐ পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাতে হস্তক্ষেপ করা কিছুতেই সম্ভব নয়, বরং অতিপবিত্র সত্তা, অর্থাৎ ফিরেশতাদের ছাড়া কেউ তা স্পর্শও করতে পারে না। তবে এর দ্বারা এদিকেও ইশারা রয়েছে যে, উর্ধ্বজগতে যেমন পবিত্র সত্তাগণই তা স্পর্শ করতে পারে তদ্রূপ দুনিয়াতে পবিত্র অবস্থায়ই তা স্পর্শ করা উচিত। তাই হাদীছ শরীফে তাহারাতের অবস্থা ছাড়া কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

কোরআনের প্রতি মুসলমানদের অতুলনীয় ভক্তি-মুহব্বতের প্রমাণ এই যে, দিন-রাত এবং বিশেষ করে কোরআন অবতরণের মাস রামাযানে তা এত বেশী পরিমাণে তেলাওয়াত করা হয়, যার ভগ্নাংশও অন্যকোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে হয় না। এমনকি যারা আরবী বোঝে না তারাও পরম ভক্তির সঙ্গে তা তিলাওয়াত করে থাকে।

পৃথিবীতে কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যার লক্ষ লক্ষ হাফেয রয়েছে। এমনকি ছোট ছোট শিশু, যারা কোরআনের অর্থ কিছুই বোঝে না তারাও অতিসহজেই কোরআন হেফয করে থাকে। এসবই কোরআনের প্রতি উম্মতের অতুলনীয় ভক্তি-মুহব্বতের প্রমাণ এবং প্রমাণ কোরআনের সত্যতার।

ইসলামে মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি তাকওয়া ও ধার্মিকতা

ইসলাম তার অনুসারীদের এ বিশ্বাস দান করেছে যে, সমগ্র মানবজাতি দু'টি অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। প্রথমত আমাদের সবার রব ও প্রতিপালক এক আল্লাহ, দ্বিতীয়ত আমরা সবাই একই আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আ.-এর সন্তান। সুতরাং বংশ, বর্ণ, ভাষা, গোত্র বা অন্য কোন ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে লোকসকল, অবশ্যই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক নর ও নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের রূপদান করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। (এর উদ্দেশ্য মর্যাদার পার্থক্য নির্ধারণ করা কিছুতেই নয়, কারণ) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া (ও ধার্মিকতা)র অধিকারী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্ব-অবগত। (আলহুজুরাত, ৪৯: ১৩)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

يا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُم وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُم واحد، ألا لا فَضْلَ لعربي على عَجَمِيٍّ ولا لِعَجَمِيٍّ على عَرَبِي، وَلا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، ولا لِأَسْوَدَ عَلى أَحْمَرَ إلا بالتَّقْوى أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا : بَلَغَ رسولُ اللَّه.

হে লোকসকল! শোনো, তাকওয়ার মাধ্যম ছাড়া কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, না অনারবের উপর আরবের, আর না আরবের উপর অনারবের; তদ্রূপ না কালোর উপর সাদার, আর না সাদার উপর কালোর। আমি পৌঁছে দিয়েছি? তাঁরা বললেন, আল্লাহর রাসূল পৌঁছে দিয়েছেন।(মুসনাদে আহমাদ-২৩৪৮৯)

ইসলামী সমাজে সেই দূর অতীতে যেমন হাবশী দাস হযরত বেলাল মসজিদে নববীর মুআযযিন হতে পেরেছেন, তেমনি পরবর্তী যুগে আযাদকৃত গোলাম হতে পেরেছে সাম্রাজ্যের শাসক। মসজিদে ছালাতের কাতারে মহামান্য বাদশাহর পাশে যেমন অতি সাধারণ মুসলমান দাঁড়াতে পারে তেমনি একজন অদ্ভুত নও মুসলিম এক দস্তরখানে এক বর্তনে আহার করতে

পারে অভিজাত সৈয়দ-এর সঙ্গে। এমন নযীরও কম নয় যে, স্বয়ং বাদশাহ তাঁর আযাদকৃত গোলামের কাছে আপন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন শুধু তার যোগ্যতা ও ধার্মিকতার কারণে।

ইসলাম একত্ববাদে আপোষহীন

ইসলামের নির্দেশে মুসলিম উম্মাহ তার আবির্ভাবকাল থেকেই তাওহীদের প্রতি আপোসহীন রয়েছে। এই আপোসহীনতা আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ইবাদতের ক্ষেত্রে, তেমনি আচার-আচরণ ও জাতীয় অনুষ্ঠান, সর্বক্ষেত্রে এমনই সমুদ্ভাসিত যা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে তারা মাথা নত করতে পারে না, জাতীয় বীর, জাতীয় পতাকা, কিংবা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যও না। যে নামেই হোক এবং যে অজুহাতেই হোক ইসলামে মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরীর অনুমতি নেই। খেলনার আকারেও মুসলিম শিশুর হাতে মানুষ বা প্রাণীর মূর্তি তুলে দেওয়ার অনুমতি নেই। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে এত পরিষ্কার নিষেধবাণী এসেছে যে, কোন প্রকার অজুহাতেরই আশ্রয় নেয়ার সুযোগ নেই। কারো যদি শরী'আতের বিধান লঙ্ঘন করার ইচ্ছা হয় তবে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু শরী'আতকে অবলম্বন করে এদিকে একচুলও আগে বাড়ার কোন সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত কতটা সংবেদনশীল তা বোঝার জন্য হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত এ ঘটনাই যথেষ্ট যে তিনি দরজায় পর্দা ঝুলিয়েছিলেন যাতে ছবি ছিলো। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।
হাদীছে এসেছে-

عن عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَومَ القِيامَةِ، يُقالُ لهم : أحيوا ما خَلَقْتُمْ؛ وفي رواية : من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা এসব ছবি তৈরী করে, কেয়ামতের দিন তাদের আযাব দেয়া হবে; বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছো তা জীবিত করো। (অন্য বর্ণনায় আছে, যারা দুনিয়াতে কোন ছবি তৈরী করবে, কেয়ামতের দিন তাদের বাধ্য করা হবে তাতে রূহ ফোঁকার জন্য, অথচ তারা ফুঁকতে পারবেনা। (মুসলিম-২১০৮,২১১০)

ইসলামে হায়া, শালীনতা ও পর্দাব্যবস্থা

শালীনতা ও লজ্জাশীলতাকে ইসলাম এমন গুরুত্ব প্রদান করেছে যার তুলনা অন্য কোন ধর্ম ও সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। হায়া ও লজ্জাশীলতাকে বলা হয়েছে ঈমানের অঙ্গ। মাহরাম ছাড়া অন্য নারী-পুরুষের মধ্যে ইসলাম কঠোরভাবে পর্দার বিধান ফরয করেছে, যা পালন করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অবশ্য কর্তব্য এবং যা তরক করা কবীরা গোনাহের কারণ। ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

আর যখন তোমরা নবীর স্ত্রীগণের কাছে কোন প্রয়োজনীয় সামান চাও তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; সেটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার উপায়। (আলআহযাব, ৩৩: ৫৩)

যেহেতু প্রসঙ্গ ছিলো নবীগৃহের সেহেতু উম্মাহাতুল মুমিনীনের কথা বলা হয়েছে, অন্যথায় মুমিনীন-মুমিনাত সবার জন্যই এ হুকুম। যেমন নীচের আয়াতে এসেছে-

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নবী, বলুন আপনার স্ত্রী-কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীগণকে, যেন তারা নিজেদের চাদর চেহারার উপর ঝুলিয়ে দেয়। এটা তাদেরকে চেনার ক্ষেত্রে সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্তক্ত করা হবে না।
(আলআহযাব, ৩৩: ৫৯)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে সমস্ত মুমিন নারীকে আদেশ করা হয়েছে যেন তারা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পর্দা রক্ষা করে বের হয়, যার একটি উপায় এই যে, যে চাদর দ্বারা সমস্ত দেহ ঢাকা হয়েছে তা দ্বারা (চক্ষু ছাড়া) পুরা চেহারাও ঢেকে নেবে। কারণ মুনাফিকরা পথেঘাটে নারীদের উত্তক্ত করতো। তাই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পর্দার এই হিকমত বয়ান করেছেন যে, মুমিন নারীরা যখন পর্দার সঙ্গে বের হবে তখন বখাটেরা বুঝতে পারবে যে, এরা শরীফ ও আবরুবতী নারী। তখন

তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা সমীহ সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে তারা পর্দাবতী নারীদের উত্তক্ত করার দুঃসাহস করবে না।

পক্ষান্তরে বেপর্দা অবস্থায় বের হলে শয়তান দুষ্টলোকের অন্তরে আরো বেশী করে কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে, ফলে নারীরা তাদের আরো বেশী উত্তক্তির শিকার হয়।

বস্তুত পর্দাব্যবস্থা ইসলামের এমনই কল্যাণময় বিধান যা অমুসলিম চিন্তানায়কগণও এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এটা নারী-পুরুষ উভয়ের নৈতিক পবিত্রতার জন্য যেমন জরুরি তেমনি নারীর আবরু রক্ষার জন্যও অপরিহার্য।

পাশ্চাত্যের নারীসমাজ, যাদের তথাকথিত স্বাধীনতার চাকচিক্যে আমরা বিভ্রান্ত হই, লুণ্ঠিত সম্ভ্রম ও আবরু-মর্যাদার জন্য আজ শুধু আহাযারী করছে। ইসলামের পর্দাব্যবস্থা তাদেরকে এমনই মুগ্ধ করছে যে, শুধু এ কারণে বহু নারী ইসলাম গ্রহণ করছে। তারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছে যে, পর্দার আড়ালে নিজেদের তারা শুধু নিরাপদই বোধ করছে না, সম্মানিতও বোধ করছে। পরিসংখ্যানেও দেখা যায়, ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী।

পর্দা সম্পর্কে মুমিন নর-নারী উভয়ের উদ্দেশ্যে কোরআনের একটি
সাধারণ নির্দেশ এই-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ منها

মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের পবিত্রতার জন্য অধিকতর সাহায়ক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আর বলুন মুমিন নারীদেরকে, যেন তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং নিজেদের শোভা প্রকাশ না করে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ পেয়ে যায়।
(আন্-নূর, ২৪:৩০-৩১)

বলাবাহুল্য যে, মানবসমাজ এবং বিশেষ করে মুসলিম সমাজ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আজ যে ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার, সর্বোপরি নারীদের জান ও আবরু-ইজ্জতের যে মর্মান্তিক নিরাপত্তাহীনতা তার প্রধান কারণই হচ্ছে পর্দাহীনতা। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি যে বিধান দিয়েছেন তা অমান্য হয়ত করা যাবে, তবে এর খেসারত আমাদেরই দিতে হবে।
আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ ও সমঝ দান করুন, আমীন।

ইসলামে বিবাহ শুধু প্রয়োজন নয়, বরং ইবাদত

পৃথিবীর সকল ধর্ম ও সভ্যতা বিবাহকে একটি সামাজিক প্রয়োজন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণের উত্তম একটি উপায়রূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিবাহকে সে ইবাদতের মর্যাদা দান
করেছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

النكاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্নত। সুতরাং যে আমার সুন্নতের উপর আমল করবে না সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। (ইবনে মাজাহ, ১৮৪৬)

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আইনি দায়দায়িত্বের বিষয়ই নয়, বরং মহাগুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী ও ঈমানী দায়-দায়িত্বেরও বিষয়। তাই বিদায় হজ্বের ভাষণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّساءِ، فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

সুতরাং নারীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তাদের তোমরা গ্রহণ করেছো আল্লাহর নিরাপত্তা দ্বারা, আর তাদের লজ্জাস্থান তোমরা হালাল করেছো আল্লাহর কালিমাহ দ্বারা।(মুসলিম-১২১৮)

অর্থাৎ যে নারী ও পুরুষ পরস্পর একেবারে বেগানা ছিলো, বিবাহের মাধ্যমে তারা পরস্পর এত কাছের, এত আপন হয়ে গেলো যে, তাদের জীবনের সুখ-শান্তি একাকার হয়ে গেলো। একজনকে ছাড়া অপরজনের জীবন কল্পনা করা পর্যন্ত কঠিন হয়ে গেলো, এমনকি উভয়ের মিলন ও বন্ধনের মাধ্যমে পরিবার অস্তিত্ব লাভ করলো এবং মানবসৃষ্টির নতুন আয়োজন শুরু

হলো। এটা কীভাবে সম্ভব হলো, শুধু এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা উভয়ের জন্য উভয়কে হালাল করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নামের আজমত ও মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এর অর্থ হলো দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে রক্ষা করতে হবে, অন্যথায় এজন্য একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং জওয়াবদেহি করতে হবে।

স্ত্রীর প্রতি সদাচারকে স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম মুমিন হওয়ার প্রমাণ বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং নিজেকে এ বিষয়ে মানদণ্ডরূপে পেশ করেছেন-

عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قالَتْ : قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : خَيْرُكُم خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের সেই সর্বোত্তম যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।(তিরমীযী-৩৮৯৫)

ইসলামে নারীর মর্যাদা

নর ও নারী হচ্ছে মানবজাতির দু'টি অংশ এবং উভয়ের সমন্বয়েই আসে পূর্ণতা। নর ছাড়া যেমন নারীজীবনের সার্থকতা নেই, তেমনি নারীর যথাযোগ্য ভূমিকা ছাড়া মানবসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা করাই সম্ভব নয়।

নর বা পুরুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শক্তি ও নেতৃত্ব; পক্ষান্তরে নারীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৌন্দর্য ও সৃষ্টি। সুতরাং সমাজ ও সভ্যতার কাছে এটাই ছিলো কাম্য যে, পুরুষ তার শক্তি ও নেতৃত্ব দ্বারা নারীকে সুরক্ষা দান করবে এবং নারীর প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কিন্তু দুঃখজনক
বাস্তবতা এই যে, ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর কোন সমাজ, সভ্যতা, এমনকি কোন ধর্মও নারীকে তার যোগ্য মর্যাদার আসনটি দান করেনি। সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারীর যে গৌরবময় ভূমিকা, তারও যথাযোগ্য স্বীকৃতি প্রদান করেনি। কোন কোন সভ্যতায় নারীর অবস্থান সেবাদাসীর চেয়ে বেশী ছিলো না, খুব বেশী হলো বিভিন্ন ছলনার আশ্রয় নিয়ে নারীকে ভোগের

সামগ্রীরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন ধর্ম নারীকে মনে করেছে পাপের উৎস, এমনকি নারীর আত্মা রয়েছে কি না তাও ছিলো ধর্মীয় বিতর্কের বিষয়।

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে মানবজীবনে নারীর পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। ইসলামই প্রথম সম্পদে নারীর মালিকানা ও উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে, অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্বামী থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণের অধিকার প্রদান করেছে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে কোরআন যা বলেছে, সত্যি তার কোন তুলনা নেই, দেখুন-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তারা হলো তোমাদের লেবাস, আর তোমরা হলে তাদের লেবাস।
লেবাস-এর একটি অর্থ হলো ভূষণ; আরেকটি অর্থ হলো আবরণ। উভয় অর্থেই আলোচ্য আয়াত নর-নারীর পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

আচ্ছা, জগতের সকল জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী একত্র হয়ে নর-নারীর মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য এর চেয়ে সুন্দর সমৃদ্ধ কোন শব্দ নির্বাচন করে দেখাক তো!

আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে কোন পার্থক্য করা হয়নি, বরং যে কোন নারী অতিসহজেই আমল-ইবাদত ও তাকওয়া-ধার্মিকতায় যে কোন পুরুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

আর যে কেউ নেক আমল করবে, হোক সে পুরুষ, বা নারী, এমন অবস্থায় যে, সে মুমিন; তো ওরাই জান্নাতে দাখেল হবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। (নিসা, ৪: ১২৪)

পিতৃত্বের চেয়ে মাতৃত্বের মর্যাদা ইসলাম অনেক উচ্চে নির্ধারণ করেছে এবং এটা একমাত্র ইসলামেরই গৌরব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে আমার সদাচারের অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার আম্মা? এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তারপর কে? আর তিনবারই তিনি বললেন, তোমার আম্মা। চতুর্থবার যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কে? তখন তিনি বললেন, তোমার
আব্বা। (বোখারী, ৫৯৭১; মুসলিম, ২৫৪৮)

এ আলোচনা এ পর্যন্তই থাকলো। ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ওলামায়ে উম্মত অনেক কিছু লিখেছেন; প্রয়োজনে সেগুলো দেখা যেতে পারে।এখানে একটা প্রশ্ন অবশ্য করা যায়, ইসলাম নারীজাতিকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে, বর্তমান মুসলিমসমাজ বাস্তব জীবনে তা কতটা অনুসরণ করছে? এটা যৌক্তিক প্রশ্ন এবং এর উত্তর সুখকর নয়। শুধু বলা যায়, সমাজে ও রাষ্ট্রে যাদের ক্ষমতা রয়েছে, নৈতিক ক্ষমতা এবং আইনের ক্ষমতা, তাদের অবশ্যকর্তব্য হলো শিক্ষায়, দীক্ষায়, অধিকারে ও মর্যাদায় নারীকে সেই অবস্থানে প্রতিষ্ঠি করা, যা ইসলাম তার জন্য নির্ধারণ করেছে। এটা না করে, আর যা কিছুই করা হবে নারীমুক্তির নামে তাতে নারীর মুক্তি তো দূরের কথা, নারীনির্যাতনের নতুন নতুন পথই শুধু খোলা হবে এবং হচ্ছে।

আত্মার সংশোধন ও পবিত্রীকরণ

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا : وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا

যে সংশোধনের মাধ্যমে নিজের নফসকে পবিত্র করলো সে-ই সফলকাম হলো, আর যে নিজের নফসকে কলুষিত করে রাখলো সে-ই হলো ব্যর্থ।
(সূরাতুশ্-শামস, ৯১:১০)

***

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

সাবধান, মানবদেহে একটি পিণ্ড রয়েছে; যখন তা বিশুদ্ধ হয়ে যায়, সমস্ত দেহ (ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল) বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহ (ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল) নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান, সেটা হলো 'কলব'। (বোখারী, হাদীছ নং ৫২. মুসলিম, ১৫৯৯)

নফসের ইছলাহ ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّه، وإذا فَسَدَتْ فسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

সাবধান, মানবদেহে একটি পিও রয়েছে; যখন তা বিশুদ্ধ হয়ে যায়, সমস্ত দেহ (ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল) বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহ (ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল) নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান, সেটা হলো 'কলব'।(বোখারী-৫২,মুসলিম-১৫৯৯)

'কলব' নামে মানুষের বুকের ভিতরে যে পিণ্ডটি বিদ্যমান, তার দু'টি দিক রয়েছে; একটি হলো শারীরিক দিক, অন্যটি আত্মিক দিক। শারীরিক দিক থেকে কলব-এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো হৃদপিণ্ড। এটি দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর সুস্থতা-অসুস্থতার উপর দেহের সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভর করে। পক্ষান্তরে আত্মিক দিক থেকে কলব-এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো হৃদয়। মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে কলবের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই কলব ও হৃদয়ই হলো যাবতীয় সুপ্রবৃত্তি ও মন্দ প্রবৃত্তি বা ফাযায়েল ও রাযায়েল-এর কেন্দ্র। কলব যদি যাবতীয় রাযায়েল থেকে পাক ছাফ হয় এবং যাবতীয় ফাযায়েল দ্বারা সজ্জিত হয় তখন মানুষ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ক্রমে উন্নতির উচ্চ শিখরে উন্নীত হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার অতি নিকটসম্পর্ক তৈরী হয়। পক্ষান্তরে কলব যদি ফাযায়েল থেকে বঞ্চিত হয়, আর বিভিন্ন রাযায়েল দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সে ক্রমে অধঃপতনের চরমে উপনীত হয় এবং আল্লাহর সঙ্গ ও সান্নিধ্য থেকে বান্দা বঞ্চিত হয়।

হাদীছ শরীফে আছে বান্দা যখন কোন গোনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে .....(মুসনাদে আহমাদ-৭৯৩৯)

কোরআনে আল্লাহ তা'আলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের যে চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো-

ويزكيهم

আর তিনি তাদের (হৃদয় ও আত্মা)কে পবিত্র করবেন।

বস্তুত কলবের তাযকিয়া হচ্ছে দ্বীন ও শরী'আতের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কলবের তাযকিয়া ছাড়া মানুষ তার নফসের খাহেশাত ও পাশবিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। তার দিলে আল্লাহর ভয় ও মুহব্বত পয়দা হয় না। ফলে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং শরী'আতের আহকাম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সম্ভব হয় না। এভাবে মানুষ আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিবর্তে ইবলীসের গোলাম হয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়।

পক্ষান্তরে কলবের তাযকিয়া দ্বারা মানুষ নফসের খাহেশাত ও পাশিবকতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তার দিলে আল্লাহ তা'আলার ভয় ও মুহব্বত পয়দা হয়। ফলে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং শরী'আতের উপর চলা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এভাবে মানুষ এমন শানে আবদিয়াত হাছিল করে যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং তাকে আপন নৈকট্য ও সান্নিধ্য দান করেন, আর সে আখেরাতের অনন্ত জীবনের কামিয়াবি ও সফলতা লাভকরে।

কলবের তাযকিয়া ও সংশোধনের যে সর্বোচ্চ স্তর সেটাকেই হাদীছ
শরীফে إحسان বলা হয়েছে?

হযরত জিবরীল আ. একবার ছাহাবা কেরামের মজলিসে মানুষের বেশে হাযির হয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীনের বিষয়ে বিভিন্ন
প্রশ্ন করলেন, যাতে ছাহাবা কেরাম দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম হাছিল করতে পারেন। একটি প্রশ্ন ছিলো, ইহসান কাকে বলে? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন-

الإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

ইহসান অর্থ এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। আর যদি আল্লাহকে দেখতে না পাও (অর্থাৎ যদি এরূপ হালাত না হয় যে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো) তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। (সুতরাং এ অনুভূতি যেন আন্তরে জাগ্রত হয় যে, আল্লাহ তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন, এটাও ইহসানের একটি স্তর।)

যেহেতু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তারবিয়াত করেছেন, যেমন হাদীছ শরীফে এসেছে-

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

আমার প্রতিপালক আমাকে আদব দিয়েছেন এবং উত্তম আদব দিয়েছেন।

সেহেতু তিনি ইহসানের এমন সর্বোচ্চ মাকাম হাছিল করেছিলেন যা অন্য কোন মানুষের পক্ষে হাছিল করা সম্ভবই নয়।

অতপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবত ও তারবিয়াত এবং তাযকিয়ার কল্যাণে ছাহাবা কেরাম নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী ইহসানের মাকাম হাছিল করেছেন। উম্মতের মধ্যে ছাহাবা কেরামই হলেন ইহসানের সর্বোচ্চ মাকামের অধিকারী।

অতপর ছাহাবা কেরামের ছোহবত, তারবিয়াত ও তাযকিয়ার কল্যাণে তাবেঈন ইহসানের মাকাম হাছিল করেছেন। এভাবে এ সিলসিলা উম্মতের মধ্যে চলে এসেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কারণ তা'লীম ও তাযকিয়া দু'টোই হচ্ছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতি দায়িত্ব, যা তিনি ওলামায়ে উম্মতের নিকট উত্তরাধিকাররূপে অর্পণ করে গিয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা: দুটো কথা

মানবতা অতীতে ও বর্তমানে অনেক মতবাদ পর্যবেক্ষণ করেছে। রাজনীতিতে গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্র এবং অর্থনীতিতে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম ইত্যাদি। রাজনৈতিক মতবাদগুলো রাজনীতিকে মুখ্য ও অর্থনীতিকে গৌণ মনে করে এবং অর্থনৈতিক মতবাদগুলো অর্থনীতিকে মুখ্য ও মানব জীবনের একমাত্র বুনিয়াদ মনে করে রাজনীতিকে গৌণ বিবেচনা করে।

মানব জীবনকে ব্যাপকভাবে অধ্যায়ন না করার ফলেই এসব ভারসাম্যহীন চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। আমার এ বক্তৃতায় এসব দীর্ঘ রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করার পর আমরা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কোনটা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পাবো।

রোমান সমাজ ব্যবস্থা

অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা রোমান সভ্যতা ও জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাই, যা দীর্ঘদিন গোটা ইউরোপকে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং যার মূল ভিত্তি ছিল দাসপ্রথা। এই সভ্যতায় স্বাধীন রোমান মানুষের চাইতে দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোমান আইন অনুযায়ী ভিন্ন দেশে যাদের সাথে তাদের কোন চুক্তি ছিল না, রোমানরা নির্বিঘ্নে তাদের ক্ষমতা দখল করে নিতে পারত।

রোমানদের জন্য বিশেষ ধরনের আইন আর অ-রোমানদের জন্য ছিল নিকৃষ্ট ভিন্ন আইন, যাকে "দুর্বলের জন্য দ্বিগুন শাস্তি বিধানকারী জাতীয় আইন" নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, এক আইনে ছিল যে, কেউ যদি কোন সতী বিধবা কিংবা কুমারীর সাথে অসসুদ্দেশ্য চরিতার্থ করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক হয়, তাহলে তাকে নিজ মালের অর্ধেক জরিমানা দিতে হবে এবং নীচু বংশের লোক হলে, তাকে বেত্রাঘাতের পর দেশান্তর করতে হবে। রোমানরা অস্ত্রের বলে প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকায় বিভিন্ন জাতি অসংখ্য যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠলে সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে।

সামন্তবাদ

এ মতবাদ রাজনৈতিক দিক থেকে মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তোলে। শাসকশ্রেণী হচ্ছে, সামন্তবাদের মুকুটমণি ও সর্বস্ব। তার পরের মর্যাদা হল সম্ভ্রান্ত লোক ও গীর্জার পাদ্রী, তারপর পেশাদার শ্রেণী এবং সর্বশেষ মর্যাদা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমিকদের। এই শ্রেণীর লোকেরা ছিল ভূমিদাস। ভূস্বামীর পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষক এবং জমির মালিকানাও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক বিচারে ভূমি ছাড়া এই ব্যবস্থায় সম্পদ বলতে অন্যকিছু থাকে না যার মালিকানা ভূস্বামীদের পূর্ণ করতলগত। কৃষকরা তাদের মধ্যে বণ্টিত জমি চাষ করবে ও ভূস্বামীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করবে। সামন্ত প্রভু অভূতপূর্ব প্রভাবের অধিকারী হওয়ায় তাদের চেষ্টায় গীর্জাগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠে।

আমরা দেখেছি, খৃষ্টবাদ ইউরোপে দীর্ঘদিন এর অনুসারীদের উপর, "শাসক কাইজারের যা প্রাপ্য আমি তাকে তা দেব এবং আল্লাহকে তাঁর যা প্রাপ্য তা দেব" এই শ্লোগানের ভিত্তিতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল এবং এরই ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা রোমান শাসকদের মর্জিমত নিয়ন্ত্রিত হত। যার ফেলে ইউরোপ তার অধিবাসীদের শান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী জীবন ব্যবস্থা উপহার দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে উঠে। মুসলমানগণ ৭১৭সালে কনষ্ট্যান্টিনোপল ও ৭৩২ সালে ফ্রান্সের পরপাটিয়া বিজয়ের ফলে ইউরোপের প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

একদিকে মুসলমানদের স্পেন বিজয় এবং অন্যদিকে অনবরত ইউরোপবাসীদের ক্রুসেড পাশ্চাত্য জাতিকে তদানীন্তন সভ্যতার ধারক মুসলমানদের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু গীর্জা কর্তৃক সৃষ্ট গোঁড়ামীর ফলে তাঁরা মুসলমানদের ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তথাপি তারা ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দীর এই দুই শতকে মুসলমানদের চিন্তাধারা থেকে নবজীবনের প্রচুর সামগ্রী লাভ করে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রকৌশল বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ে বর্ধিত জ্ঞান লাভ করায় তাদের আধুনিক ভৌগলিক জ্ঞানের পরিসর অধিকতর সম্প্রসারিত হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ উপরোল্লিখিত এই নুতন আন্দোলনের সূচনা হয়।

রাষ্ট্রের বর্তমান আইন ও সামন্ত প্রভুদের গীর্জার অভিভাবকত্ব এই নব্য গোষ্ঠীর বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা বিজ্ঞান ও সমাজের সবকিছুতে বিস্তার লাভ করে, অবশেষে যা গীর্জার ক্ষমতাকে খর্ব করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ ইউরোপে নুতন এক সুর ধ্বনিত হয় যে, রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। আর এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং এখান থেকেই প্রথম বারের মত সুদ ও তার বৈধতা সম্পর্কে আওয়ায উঠে। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মে এই সুদ নিষিদ্ধ ছিল।

শিল্প বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক বিকাশের ফলে ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনেরা বিজ্ঞানের এই নব আবিষ্কার থেকে সর্বপ্রথম ফায়দা লুটতে থাকে। কেননা, তারাই তখন সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। ফলে তারা এই নব্য আবিষ্কার, কলা-কৌশল ও প্রশাসনিক যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে 'পুঁজিবাদ' নামক শিল্প ও ব্যবসার এক নুতন ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

পুঁজিবাদ

মূলত পুঁজিবাদের জন্ম হয় ব্যবসায়ী, সুদখোর, পেশাদার ও বিজ্ঞানী এই বুর্জোয়া শ্রেণীসমূহকে অস্বাভাবিক ক্ষমতা এবং সামন্তবাদ ও গীর্জার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কারণে। জাতির কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর নির্যাতিত হওয়াও এর অন্যতম কারণ। সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ী ও অন্যরা স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে সামন্তবাদের অবসান, গীর্জার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ব্যক্তির বাক,
কর্ম ও ব্যবসার স্বাধীনতা নিশ্চিতকারী এক মতবাদ কায়েমের জন্য চেষ্টা চালায়। যার ফলে ফরাসী বিপ্লবসহ কতিপয় রাজনৈতিক বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের মূল শ্লোগান ছিল, 'লেইসেস ফেয়ার' অর্থাৎ "অবাধ কাজ করতে দাও ও চলতে দাও।"

আশ্চর্যের বিষয় হল, স্বাধীনতার এই প্রবক্তারা বিজয় লাভ করার পর নিজেরা রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্ণধার হয় বটে কিন্তু কৃষক-শ্রমিকসহ সামন্তবাদের নির্যাতিত আপামর জনতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাণ্ডারী হওয়ার কোন সুযোগ পায় না। পরিণামে এই স্বাধীনতা সুদখোর মহাজন ও পুঁজিবাদিদের সম্পদ বৃদ্ধি সহায়ক উপায়ে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্র অন্যদের জন্য নয় বরং তাদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা নিজেদের পণ্যজাত দ্রব্যের বাজার

অন্বেষণ করে ও সস্তায় কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুঁজতে থাকে। তারাই রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীকে উপনিবেশ সৃষ্টি করতে বাধ্য করে, অতঃপর লোকদেরকে নির্দয়ভাবে গোলামে পরিণত করে।

পুঁজিবাদের গোড়ার কথা হল, ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের মালিক সে নিজেই, এতে অন্য কারোর অধিকার নেই, নিজ ইচ্ছামত সে তা ভোগ ব্যবহার করবে, এতে কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা থাকতে পারবে না। সে নিজের ইচ্ছামত মওজুদদারী গড়ে তুলতে পারবে এবং কেবল নিজের মর্জি অনুযায়ী এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। এতে অন্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা দেখার প্রয়োজন নেই। সুদকে সে বৈধ মনে করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সুদী মহাজন ও মালিক পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যাপারে (যারা ধনীদের তুলনায় দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে) রাষ্ট্রের তেমন কিছু করার নেই, নেই কোন ধর্মীয় ও নৈতিক বাধা। তাদের শ্লোগান হল "ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর জন্য এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সবার জন্য।"

এর ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে এবং গরীব আরো গরীব হয়। শিল্পপতিরা নিজেরাই একা শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ করে। কোন সময় বিনা বেতনে, বিনা ছুটিতে ও কাজের সময় সীমা নির্ধারণ করা ছাড়াই কাজ আদায়ের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। শ্রমিকদেরকে প্রদত্ত কম বেতনে (তাদের সংসারতো চলেই না, তার উপর পুঁজিবাদীরা নারী ও শিশুদের থেকেও স্বল্প বেতনে তাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে) সেবা আদায় করে, ফলে তাদের রোগ-শোক ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্বের হারও বেড়ে যায়।
এ সবের ফলে সৃষ্ট ঘৃণা ও বিদ্বেষ গরীবদেরকে মুক্তির আশায় হিংসাত্মক অন্য আর এক নুতন বিপ্লব সাধন করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার শ্লোগানই হল হত্যা ও রক্তপাত এবং নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। আর এই ব্যবস্থার নামই হল কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র।

কম্যুনিজম

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূলকথা হল, উৎপাদন উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। ব্যক্তি এসবের মালিক হতে পারবে না এবং নিজ ইচ্ছামত এগুলোর ভোগ-ব্যবহারও করতে পারবে না। কাজের বিনিময়ে রাষ্ট্র থেকে তারা ভাতা লাভ করবে। সমাজের দায়িত্ব হল নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা দেখা।

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা ও উত্তরাধিকারের কোন অস্তিত্ব নেই। কম্যুনিষ্টরা ইতিহাসের বক্তৃতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করে ও ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্য "নিষিদ্ধ আফিম" স্বরূপ। এই মতবাদ শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান জানায়।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদসহ পৃথিবীতে আরো অনেক মতবাদ রয়েছে। আমি এগুলো সম্পর্কে আর অধিক আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু সংক্ষেপে এতটুকু বলব যে, হিটলার ও মুসোলিনীর জীবদ্দশায় বিজয়ের মুহূর্তে এর কিছু অনুসারী থাকলেও পরবর্তীতে ইতিহাসের বিবেচনায় এ দু'টি ছিল একনায়কত্ব-বাদী শাসন, যা জাতির লোকদেরকে কল্যাণ ও প্রশান্তি দান করতে সক্ষম হয়নি।

মানবীয় মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত সার

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা দেখেছি কি করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নিজেদের তৈরী মনগড়া মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে। একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট, মানুষ নিজেই একান্ত নিজের জ্ঞান থেকে আইন তৈরী করতে পারে না। কেননা, মানবীয় জ্ঞান কোন সময়ই স্বার্থপরতা ও ত্রুটিমুক্ত নয়। অনেক সময় কাজ বিশেষের প্রতি তার অগ্রাধিকারও থাকে। বস্তুত জগতে চোখে যা দেখে তাকেই সে বাস্তব ও সত্য মনে করে আর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত বিষয়াবলীকে সে সত্য মনে করে না। তাই দেখা যায়, এসব মতাদর্শে কেবল কৃষি, শিল্প উৎপাদন ও অপরাপর বস্তুগত ব্যাপক উন্নয়নের চিন্তা করা হয় এবং মানুষের অনুভূত প্রয়োজনসমূহ যেমন ভাত-কাপড়, বাসস্থান ও যৌন চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। অথচ এ ব্যবস্থায় মানুষের রূহানী ও আত্মিক প্রয়োজনের কথাকে স্বীকার করা হয় না এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের জিনিসগুলোকে অস্বীকার করা হয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নৈতিক-চারিত্রিক গুণাবলী স্বীকার করা হয় না। ফলে মানুষ এই পার্থিব জীবনে বস্তুগত উন্নয়ন লাভ করলেও এগুলো ঈমান ও বিশ্বাসের অভাবে প্রাণহীন বিষয়ে পরিণত হয় এবং পরে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই মতবাদে যৌনক্ষুধা পূরণ করাকে সহজলভ্য করা হয়, পারস্পরিক সংঘর্ষে ঘুম দূরীভূত হয় ও জীবন কলুষিত হয়ে ওঠে, শরীর ও মনের আরাম হারাম হয়ে যায়। সেখানকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ তখন ব্যক্তি ও তার আত্মা থেকে শুরু করে দল, দেশ, সেনাবাহিনী, জংগী বিমান, কামান ও যমীনের ধ্বংসলীলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে।

উপরে বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি, মানবতা আজ দুনিয়া ও পরকালের সমন্বয় সাধনকারী, আত্মা ও বিবেকের প্রয়োজন পূরণকারী এবং মানুষের

নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধনকারী উপযুক্ত এক জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছে। তাই এ মুহূর্তে মানুষের অতীতের দুঃখ দুর্দশা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়ানো মানবতা তাকে হাতে ধরে উদ্ধার করার জন্য এক পরিত্রাণকারী অপেক্ষায় দিন গুনছে, ব্যাকুল আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে এমন এক অনুগ্রহপূর্ণ সময়ের যখন কোন দয়ালু শক্তি তাকে ভালবাসা ও প্রশান্তির দিকে আহ্বান জানাবে।

ইসলাম হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক যে জীবন বিধান মানুষের প্রয়োজন, তার সন্ধান লাভ করার জন্য জ্ঞানের অবসাদগ্রস্ততা দূর করে খোলা মন নিয়ে জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাবো, সে জীবন ব্যবস্থাটি হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। যার মধ্যে নেই কোন বক্রতা, বিভ্রান্তি ও অকল্যাণ, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ - آل عمران١٨

আল্লাহ নিজেই এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, ফেরেশতা এবং সব জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্যই দিচ্ছেন। (আলে ইমরান: ১৮)

এই ইসলাম সেই মন্ত্রের ইসলাম নয় যা মুখস্থ পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়, আর না তা কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম যা আদায় করলে আর কিছু করার থাকে না। বরং এ হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাংগীন ও পূর্ণাঙ্গ এক জীবন ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَام- ُ

ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শ। (আলে ইমরান: ১৯)

তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ -آل عمران :

ইসলাম ব্যতীত যারা অন্য কোন জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহ কখনো তা গ্রহণ করেন না। (আলে ইমরান: ৮৫)

এই জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا - المائدة

আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (আল মায়েদা : ৩)

আল্লাহ বলেন:

وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ - القصص

আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা পরকালের ঘর বানিয়ে নাও, দুনিয়ার হিসেবকেও ভুলো না এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করেন তোমরাও অনুরূপ অনগ্রহ প্রদর্শন করবে। (আল কাসাস : ৭৭)

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ - التوبة :
٣٣ ، الصف

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীন নিয়ে এজন্য পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এটাকে অন্যান্য সব মতাদর্শের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও তা মুশরিকদের পছন্দনীয় নয়। (আত তাওবা: ৩৩, আস্ সফ: ৯)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ ইসলামকে মানবতার জন্য নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন যাতে মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেন; وَمَا أَتَٰكُمُ الرَّسُولُفَخُذُوهُ - وَمَا نَهَٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا - الحشر হযরত মুহাম্মদ (সা) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যে সব কাজ থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাক।

(আল হাশর: ৭)

কুরআনের কিছু অংশকে গ্রহণ করা এবং বাকী অংশগুলোকে গ্রহণ না করা মারাত্মক অন্যায় ও সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ধারণা। এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন:

افَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ - فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَّ الْعَذَابِ - البقرة :

তোমরা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করবে? এমন যদি কেউ করে তাহলে এ দুনিয়ায় তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। (আল বাকারা: ৮৫)

হাদীসে এসেছে নবী (সা) বলেন, لأَرَهْبَانِيَّةَ فِى الْإِسْلَام "ইসলামে বৈরাগ্যের ঠাঁই নেই।" মোটকথা, ইসলাম হচ্ছে বিশ্বাস ও ইবাদত, রাজনীতি ও নেতৃত্ব, অর্থনীতি ও আইন, যুদ্ধ ও শান্তির নীতি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ ও প্রশিক্ষণের জন্য এক নিখুঁত ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এসব কথাগুলো আমি আবেগের বশবর্তী হয়ে বলছি না বরং আমি এখন ইসলামের কতিপয় দিক বিশ্লেষণ করে এর যথার্থতা প্রমাণের প্রয়াস পাব।

ক. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 'যোগ্য নাগরিক' সৃষ্টি করা, যদিও নাগরিক ও তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন কোন সংজ্ঞা নেই। কেননা, বিভিন্ন জাতির নিকট এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কোন দেশে এর অর্থ হল অন্যায় ও বিদ্রোহ দমন করা কিংবা বিদ্রোহ দমনে অতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা অথবা সে এমন একজন ভাল লোক যে অন্যায় ও বাড়াবাড়ি

পছন্দ করে না, কোন সময় সে আবেদ হয় যে পার্থিব জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দ্বন্দু-সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে, কোন সময় সে দেশপ্রেমিক হয় ও নিজস্ব বর্ণ রক্ষার জন্য উন্মাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতদসত্ত্বেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এরা সবাই দেশের যোগ্য নাগরিক। ইসলাম নিজেকে এহেন সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করেনি। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক নয় বরং 'যোগ্য মানুষ' গড়ার ব্যাপক লক্ষ্য অর্জন করতে চায়।

মানুষ শব্দটি ব্যাপক মনুষত্ব 'অর্থবোধক'। এই অর্থে মানুষ শুধু নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের নাগরিকই নয়, এরও ঊর্ধ্বে উঠে সে হচ্ছে কেবল 'মানুষই'। কুরআন মানুষকে ইসলামী শিক্ষার এই ব্যাপক ধারণা দান করতে গিয়ে বলেছে:

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ - التكوير (আত তাকবীর: ২৭) অর্থাৎ এই হচ্ছে গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য উপদেশ।

আল্লাহ বলেন

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَكُمْ - الحجرات١٣ :

'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু সে আল্লাহর নিকট ততবেশী সম্মানিত।'

ইসলামের এই শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, আত্মা বৈষয়িক ও নৈতিক সর্বদিক ব্যাপৃত। ইসলাম মানুষকে শরীর জ্ঞান ও আত্মার সমন্বিত এক পূর্ণ অবয়ব মনে করে। এগুলোসহ তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক যাবতীয় কাজের সর্বাত্মক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট মানুষের স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট্যের উপর কোন যোগ বিয়োগ করা যায় না। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল এটি ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবীয় কাঠামো হল শরীর, আত্মা ও বিবেকের সমন্বিত নাম। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয় কিংবা এমনও নয় যে একটার সাথে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মা বিশেষ এক নিয়ামত এবং শরীরের কেন্দ্রবিন্দু ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির বাহন। ইসলামে আত্মার প্রশিক্ষণ বলতে বুঝায় সকল কাজ, চিন্তা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক ও সংযোগ সংঘটিত হওয়া। আল্লাহ মানুষকে অসম্ভব কোন কাজের হুকুম দেন না।

আল্লাহ মানুষকে যথাসাধ্য আল্লাহভীরু হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ - التغابن١٦:

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহভীরু হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। (আততাগাবুন: ১৬)

আল্লাহ আরো বলেন:

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - البقرة١٨٦ :

আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কাজের হুকুম দেন না। (আল বাকারা: ১৮৬)

এই ব্যবস্থায় মানুষকে পশুসুলভ জড়বাদী প্রাণী হিসেবে বিবেচনাকারী মতবাদকে অস্বীকার করা হয়, যা মানুষকে যৌন কামনার দিকে আহ্বান জানায় এবং তাদের উঁচু মর্যাদাকে অস্বীকার করে তাদেরকে ভোগবাদী প্রাণীতে পরিণত করে এবং তাদের শেষ পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

খ. ইসলামী অর্থনীতি

জড়বাদী অর্থনীতিবিদদের মত ইসলাম মানুষকে অর্থনৈতিক জীব হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে তাদের জৈবিক চাহিদা, ইচ্ছা আকাঙ্খা ও আবেগ পূরণ করার সাথে সাথে তার ব্যক্তিসত্তাকে মৌলিক গুরুত্ব দিয়ে এক নিপুণ অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। শুধু সামগ্রিক সত্তার উপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব এজন্য আরোপ করা হয়নি যে কাউকে সত্যিকার অর্থে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হতে পারে না। জীবিকা অর্জনে স্বাধীনতা না থাকার অর্থ হল তার মূলতই কোন স্বাধীনতা নেই। আমি ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক বিষয়ের উপর এখন আলোচনা করব।

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ

প্রথমতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ আল্লাহর, মানুষ এতে আল্লাহর প্রতিনিধি।

কোন মুসলিম একথা বলতে পারে না যে, আমার জ্ঞানের বদৌলতে আমাকে এ সম্পদ দান করা হয়েছে। বরং সে সব সময় যে কথা স্মরণ করে তা হচ্ছে:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ - الحديد

তিনি যে সম্পদে তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন সে সম্পদ থেকে খরচ কর। (সূরা হাদীদ: ৭)

জাতীয় কল্যাণের সাথে সংগতি রেখে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ

দ্বিতীয়তঃ জাতীয় কল্যাণের সাথে সংগতি রেখে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে। উত্তম লোকের উত্তম মাল কতই না উৎকৃষ্ট। একটাই শর্ত তা হল, অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।

ব্যক্তির মালিকানার উপর আরোপিত শর্তসমূহ নিম্নরূপ:

এক. আয়ের উৎস হারাম হতে পারবে না এবং হারাম কাজে অর্থ ব্যয়িত হতে পারবে না। কুরআন বলছে:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ - وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نارا - النساء-٢٩ : ٣٠

হে মুমিনগণ, অন্যায়ভাবে তোমরা একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না, হ্যাঁ, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসা ব্যতীত (অর্থাৎ তা ভোগ করতে পারবে)। নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। যে অন্যায়ভাবে তা করবে খুব শীঘ্রই আমরা তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। (সূরা নিসা: ২৯-৩০)

দুই. মওজুদদারী নিষিদ্ধ:

আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - التوبة٣٤ :
যারা সোনা-রূপা জমা রাখে ও তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক কঠিন আযাবের সুসংবাদ দান কর। (সূরা আত তাওবা: ৩৪)

উল্লেখ্য যে, লর্ড কেইনসসহ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মওজুদদারীর কুফলের কথা স্বীকার করেছেন, যার ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

তিন. অপব্যয় না করা:

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشيطين - بني اسرائيل٢٧:

নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। (বানী ইসরাইল: ২৭)

আল্লাহ আরো বলেন:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عنقك ولا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا - بني اسرائيل٢٩ :

তোমাদের দানের হাত গুটিয়ে একেবারে গলদেশ পর্যন্ত আটকে রেখো না কিংবা সম্পূর্ণ উন্মুক্তও করে দিও না, যার ফলে তুমি পরবর্তীতে আফসোস করতে থাকবে এবং লোকদের নিকট তিরষ্কৃত হতে থাকবে। (সূরা বানী ইসরাইল: ২৯)

কুরআন আরো বলছে:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - الاعراف:
তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় কর না। আল্লাহ অবশ্যইঅপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা আ'রাফ: ৩১)

কুরআন কার্পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে বলেছে:
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا

لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ - ال عمران١٨٠ :

যারা আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের কার্পণ্য করে তারা যেন তাদের এ কাজকে উত্তম বলে মনে না করে, বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। (সূরা আলে ইমরান: ১৮০)

চার. ইসলামী রাষ্ট্র দুর্বল, অসহায় লোকদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে। তাই মালিক থেকে শ্রমিকের অধিকার আদায় ও তা সংরক্ষণ করা, নিম্নতম বেতন ও কাজের অধিক সময় সীমা নির্ধারণ ও কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়ার পর পেনশন ধার্য করার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে।

কুরআন বলছে :

وَلْيُمْلِلُ الَّذى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ - (البقرة(٢٨٢) :

আর লিখাবে ও লেখ্য বিষয় বলে দেবে ঋণগ্রহীতা। স্বীয় রব আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে, তাতে যেন কোন প্রকার কম-বেশী করা না হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখ্য বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক যাতে ইনসাফ সহকারে লিখিয়ে দেয়। (সূরা বাকারা: ২৮২)

স্মরণযোগ্য যে, ইউরোপে এসব অধিকার পূরণ হচ্ছে না বলে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে এসব আদায়ের চেষ্টা করছে। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং অনেক দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও শান্তির ভিতকে নাড়িয়ে তুলছে। অথচ ইসলাম মানব রচিত মতবাদের অনেক পূর্বেই দুর্বল ও শ্রমিকের অধিকারের পন্থা বাতলিয়েছে। এমনকি ইসলামের প্রথম খলিফা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করেছিলেন: ُالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَخَذَ الْحَقّ لَه

'তোমাদের দুর্বলরা আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তাদের অধিকার আদায় করতে পারি।'

রাষ্ট্র অনুরূপভাবে মওজুদদারী ও জুয়াসহ ইত্যাকার হারাম ব্যাপারে যে কোন সময় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

তৃতীয়তঃ কুরআনের আয়াত সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ বলেন:أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا - البقرة٢٧ :

আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন (সূরা বাকারা: ২৭৫)
আল্লাহ বলেন:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ - (النساء(١٦١ :

তাদেরকে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কথা বলা সত্ত্বেও তারা সুদ গ্রহণ করছে।

(সূরা নিসা: ১৬১)

আল্লাহ বলেন:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدقت - (البقرة(٢٧٦ :

আল্লাহ সুদকে বিনষ্ট করেন ও সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। (সূরা বাকারা: ২৭৬)

আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا أَتَيْتُمْ مِّنَ الرِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
الله - الروم٣٩ :

মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দান কর, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। (সূরা রূম: ৩৯)

নবী (সা) বলেন:

الا وَإِنَّ الرِّبَا مَوْضُوع وَأَوَّلُ رِبَا أَبْدَا بِهِ رِبَا عَمِّى الْعَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِب

নিশ্চয়ই সুদ পরিত্যাজ্য এবং সর্বপ্রথম আমি যে ব্যক্তির সুদ বন্ধ করেছি তিনি হচ্ছেন আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব।

এমনকি মুসলমান সংস্কারকরা পর্যন্ত সুদের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করতে ইতস্ততঃ বোধ করত। তারা এই বলে প্রতারিত হত যে, বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির চাকা হচ্ছে সুদ। কাজেই সুদ ছাড়া অর্থনীতি অচল। আল্লাহ সুদখোরদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করলেন কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ও বিশ্বে আর্থিক নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে। এ যেন তাঁরই সেই সতর্ক বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন যেখানে তিনি বলেছেন:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - البقرة٢٧٩ :

যদি তোমরা সুদ বন্ধ না কর তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তোমাদের পুঁজি তোমাদের নিকট ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে। না তোমরা জুলুম করবে, না তোমাদের উপর জুলুম করা হবে। (সূরা বাকারা: ২৭৯)

বিশ্ব সুদখোরদের ব্যাপারে আল্লাহর এই বক্তব্যও প্রযোজ্য যাতে তিনি বলেছেন: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبوا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس - البقرة٢٧٥ :

যারা সুদ গ্রহণ করে তারা শয়তানের স্পর্শ দ্বারা জ্ঞান শূন্য পাগল লোকের ন্যায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়। (সূরা বাকারা: ২৭৫)

পরে হলেও অনেক অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেছেন যে, সুদের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এতে গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ জমা হয় যা পরিণতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ টেনে আনে। কম্যুনিজমেও সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর সুদের পক্ষে বস্তুবাদী লোকদের যুক্তি উত্থাপনের প্রচেষ্টা হাস্যকর ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

গ. সামাজিক যিম্মাদারী

চতুর্থতঃ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয় ও অনাত্মীয় লোকদের সাহায্য করা কর্তব্য। অক্ষম পিতাকে লালন-পালন করা সন্তানের দায়িত্ব এবং পঙ্গু সন্তানকে লালন-পালন করা পিতার কর্তব্য।

ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিক পক্ষ যদি কর্মচারীদের বেতন ভাতা ঠিকমত না দেয় তা আদায় করে দেওয়াও কর্তব্য। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) এক ধনী ব্যক্তিকে শাস্তি দানের ধমক দিয়েছিলেন। কেননা, তার এক শ্রমিক চুরি করেছিল। কারণ অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হল, শ্রমিককে তার নিম্নতম প্রয়োজন পূরণ করার মত বেতন দেয়া হয় না বলে সে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বোপরি, তিনি রাষ্ট্রের প্রতিটি লোকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করাকে রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে স্থির করে দেন। সাময়িক বেকার, এতিম সন্তান, রোগীর চিকিৎসা, অভুক্তদের খাবার দান, উলঙ্গকে কাপড় দান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম লোকদের সাহায্য করা হচ্ছে উত্তম সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যা ইসলামী রাষ্ট্রে অবশ্য করণীয়।

ইসলাম যা চায় তা হল সম্পদ সমাজের কোন এক জায়গায় কুক্ষিগত না থাকুক এবং যারা নিজেদের ভাগ্য ও যোগ্যতার বদৌলতে বাড়তি সম্পদ অর্জন করেছে তা মওজুদ রাখা না হোক বরং সম্পদের আবর্তনের দ্বারা ভাগ্য নিপীড়িত ও
বঞ্চিত লোকদের প্রতি তা খরচ করা হোক। এজন্যই ইসলাম দান ও সামাজিক সহযোগিতার প্রবণতাকে নিজস্ব উন্নত নৈতিক চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং দান ও খরচ করাকে উৎসাহিত করেছে এবং মওজুদদারীকে নিরুৎসাহিত করেছে।

যাকাত

পঞ্চমতঃ সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করে সমাজের সমৃদ্ধি ও কল্যাণে ব্যয় করার নিয়মকে ইসলামে যাকাত বলা হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামে নামাযের পরই যাকাতের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়। আল্লাহ বলেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا - التوبة١٠٣ :

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র কর। (সূরা আত্ তাওবা: ১০৩)

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। প্রত্যেক বছরের সংগৃহীত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহর রাস্তায় না দিলে মাল পবিত্র হয় না। আল্লাহ নিজে যাকাতের মুখাপেক্ষী নন। যাকাতকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার তাৎপর্য হল, অভাবী লোকের কল্যাণ, জমিনের আবাদী ও কল্যাণমূলক শিল্প উন্নয়ন খাতে তা ব্যয় করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينَ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السبيل - التوبة٦٠ :

যাকাত হচ্ছে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোক, যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী, অমুসলিমদের অন্তর জয় করার কাজ, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত লোক, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ও মুসাফিরদের জন্য। (সূরা আত্ তাওবা: ৬০)

এখানে উল্লেখ্য যে, যে মালের যাকাত দেয়া হবে, সে মাল মওজুদদারীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় যদি পুঁজি বিনিয়োগ করা না হয় এবং বছর বছর যাকাত দেয়া হয়, তাহলে জমাকৃত সম্পদ মাত্র ৪০ বছরের কম সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমাজে কত বেশী কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনতে পারে ইতিহাস থেকে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর শাসনামলের দিকে তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারি। তিনি যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীদেরকে যাকাত সংগ্রহ করে তা গরীব মুসলমানদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। অতঃপর যখন সমগ্র দেশ খুঁজেও কোন গরীব মুসলমানের সন্ধান পাওয়া গেল না তখন খলিফা উক্ত অর্থ অমুসলমান গরীবদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। গোটা দেশ ঘুরে এসে কর্মচারীরা বললেন, হে খলিফাতুল মুসলেমিন! ইসলামের শাশ্বত ও কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থার ফলে শুধু মুসলমান নয়, অমুসলমান গরীবরা পর্যন্ত ধনী হয়ে গেছে। তাই এই যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার মত উপযোগী লোক দেশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা এখন কি করব? খলিফা বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, এই অর্থ এখন রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় কর।

ঘ. উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ

ষষ্ঠতঃ ওয়ারিশদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ও সূক্ষ্মভাবে সম্পদ বণ্টন এবং বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ইসলামের উত্তরাধিকার আইন মানুষের তৈরী পদ্ধতি থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। কুরআন ও হাদীসের যে কোন পাঠকের কাছে প্রথমেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, মৃত ব্যক্তির ৩ ভাগের ২ ভাগ সম্পদে নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকার সূত্রকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশে উত্তরাধিকারকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের জন্য অসিয়ত করা যেতে পারে। তবে তা কোন মতেই ওয়ারিশের জন্য হতে পারবে না। যাতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হিস্সা বিকৃত না হয়। এভাবেই সম্পদ একজনের কাছে জমা না হয়ে অনেকের নিকট ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরাধিকারহীন ব্যক্তির সম্পদ রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হবে যার দ্বারা গোটা জাতি উপকৃত হবে। এটা না করে মুখ ডাকা ছেলে বানিয়ে তাকে উত্তরাধিকারী বানানো যাবে না।

উত্তরাধিকারহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় মীরাসের মাধ্যমে পরিবারের লোকদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হচ্ছে মধ্যমপন্থী সমাধান। পুঁজিবাদে মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মালিকের মৃত্যুর পর উক্ত সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা কিংবা বৃটেনের পিতার বড় সন্তান সমস্ত সম্পদ লাভ করার মত জঘন্য ব্যবস্থা থেকে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনেক শ্রেষ্ঠ। এর মাধ্যমে পরিবারকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা সমাজের মূল ইউনিট হিসেবে বিবেচিত। যে মুহূর্তে পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে সে মুহূর্তে সে খোদ সমাজেই প্রবেশ করছে।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক মৌলিক বিষয়। এতে কোন নৈরাজ্য থাকতে পারে না এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন রয়েছে সৎ নেতৃত্বের। ইসলামের দুশমনরা কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে এ সংশয় ঢোকাতে সক্ষম হয়েছে যে, ইসলামে রাজনীতি নেই এবং ইসলাম এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফলে তারা দীনকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। অথচ তারা আল্লাহর সেই সতর্ক বাণীকে ভুলে গেছে। যাতে তিনি বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
)النساء(٦٥ :

হে রাসূল, আপনার রব-এর কসম, এরা কখনো মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের ঝগড়া বিবাদের ফয়সালার জন্য শাসক মেনে নেয়, আপনার ফয়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন সন্দেহ পোষণ না করে এবং আপনার ফয়সালাকে হুবহু গ্রহণ করে। (সূরা নিসা: ৬৫)

আল্লাহ আরো বলেন:

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ النساء٥٩ :

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেসব লোকদের যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। (সূরা নিসা: ৫৯)

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ থেকে আমি নিম্নে এর কয়েকটি পেশ করব।

১. শাসন করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর

শাসন করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর, আর কারোর নয়। আল্লাহ বলেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - سورة الانعام٥٧ :

শাসন চলবে কেবল মাত্র আল্লাহর। (সূরা আল আন'আম : ৫৭)

আল্লাহ বলেন:

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ - البروج١٦ :

"তিনি যা ইচ্ছা সব কিছু করেন।" (সূরা আল বুরূজ: ১৬)

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ - يس٨٣ :

"ক্ষমতার বাগডোর তারই হাতে নিহিত"। (সূরা ইয়াসীন: ৮৩)

"কোন শক্তি তাঁর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি লোকদেরকে সাহায্য করেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারে না। কোন ব্যক্তি, দল কিংবা রাষ্ট্র মানুষের উপর তাদের নিজেদের রচিত আইন চাপিয়ে দিতে পারেনা। আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء. ۚ
)الاعراف٣) :

তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে যে আইন-বিধান নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর আইনের অনুসরণ করো না।
(সূরা আ'রাফ: ৩)

আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ - المائدة٤٤ :

আল্লাহর অবর্তীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা হল কাফের।
(সূরা মায়েদা : ৪৪)

এখন একথা পরিষ্কার যে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং তিনিই যাবতীয়

ক্ষমতার উৎস।

২. পরামর্শ

শাসন ব্যবস্থা পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ - ال عمران١٥٩ :

কাজে পরামর্শ গ্রহণ কর। (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

আল্লাহ বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ - الشورى٣٨ :

"পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের (মুমিন) কাজ পরিচালিত হয়।"
(সূরা আশ্ শূরা: ৩৮)

নবী (সা) বলেছেন:

لَوْ كُنْتُ مُؤْمِرًا أَحَدًا دُونَ مُشْوَرَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُ بْنِ أَمْ عَبْد. ِ

মুমিনদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত যদি আমি কাউকে আমীর নিযুক্ত করতাম তাহলে সে ব্যক্তি হত ইবনে উম্মে আবদ্।

এখন প্রমাণিত হল যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য। কেননা, স্বয়ং নবী করীম (সা) পর্যন্ত পরামর্শ ব্যতীত কাউকে আমীর নিয়োগ করার অধিকার রাখেন না। পরামর্শের পদ্ধতি কি হবে ইসলাম তা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। স্বভাবতই স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর পার্থক্য সূচিত হতে পারে। নবী করীম (সা)-এর সময় তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট তদানীন্তন সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল চিন্তাবিদ সাহাবায়ে কেরামদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে অহী নাযিল হয়নি সেসব ব্যাপারে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে বাক স্বাধীনতা ও জাগতিক কর্ম সংঘটিত করার স্বাধীনতা দিতেন। কেননা, কৃষি ও অন্যান্য জ্ঞানগত ব্যাপারে দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের রায় দেয়ার যোগ্যতা ছিল।

৩. অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব

রাষ্ট্রীয় শাসন হচ্ছে অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব। শাসক আল্লাহ ও বান্দাহর নিকট দায়ী থাকবে। শাসক জনগণের বেতনভুক্ত কর্মচারীও বটে। হাদীসে উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عن رعيته-

তোমাদের প্রত্যেকেই যিম্মাদার এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নেতাও অনুরূপ যিম্মাদার, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

খলিফা আবু বকর (রা) শাসনভার লাভ করার পর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন:

أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ أَحْتَرِفُ لِعَيَالِي فَاكْتَسِبُ قُوْتَهُمْ فَأَنَا الْآنَ
أَحْتَرِفُ لَكُمْ فَاقْرِضُوا لِى مِنْ بَيْتِ مَالِكُم- ْ

হে লোকেরা! আমি কাজ করে পরিবারের জন্য উপার্জন করতাম, এখন আমি আপনাদের জন্য কাজ করছি। আপনারাই আমার জন্য বায়তুল মাল থেকে একটা ভাতা নির্ধারিত করে দিন।

খলিফার আনুগত্য জাতির উপর কর্তব্য। আল্লাহ বলেন:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم. ْ

)النساء(٥٩ :

তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও শাসকের আনুগত্য কর। (সূরা নিসা: ৫৯)
তবে অন্যায় কাজে আনুগত্য করা যাবে না।

হাদীসে রয়েছে:

لأَطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ- ِ

'আল্লাহর নাফরমানীতে কোন আনুগত্য নেই।'

রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতার দায়িত্বানুভূতি হযরত ওমর (রা)-এর হৃদয়ের গভীরে নাড়া দিয়েছিল। খেলাফতের দায়িত্বের ভারে তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর কন্যা জিজ্ঞেস করলেন, আব্বা কেন কাঁদছেন? আপনি তো দুনিয়াতেই আগাম বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন, ইরাকের রাস্তায়ও যদি পা পিছলিয়ে কোন গাধা পড়ে যায় সে জন্য আমাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে, কেন আমি উক্ত রাস্তা মেরামত করিনি।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেন:

فَإِنْ رَأَيْتُمُونِي عَلَى حَقٍّ فَأَعِينُونِي وَإِنْ رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ
فَسَدِّدُونِي أَوْ قَوْمُونِي-

যদি তোমরা আমাকে সত্যের উপর চলতে দেখ তাহলে আমাকে সাহায্য কর, আর যদি অসত্যের উপর চলতে দেখ তাহলে আমাকে সোজা করে দাও।

৪. জাতীয় ঐক্য

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার চতুর্থ মূলনীতি হল জাতীয় ঐক্য। মিল্লাতে ইসলামিয়া একই উম্মত। ঈমান তাদেরকে একই উম্মতের অনুসারী করে দিয়েছে।
কুরআন বলছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ - الحجرات١٠ :

নিশ্চয়ই মুমিনেরা একে অপরের ভাই। (সূরা হুজরাত : ১০)

কুরআনে আরো আছে:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ - الانبياء٩٢ :

তোমাদের এই মিল্লাত একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, আমি তোমাদের প্রভু, তোমরা আমার ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া: ৯২)

হাদীসে এসেছে:

الْمُسْلِمُ أَخُوا الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُه. ُ

'একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানের ভাই, সে তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না।

এখানে তারা ُالدِّيْنُ النَّصَيْحَة 'দীন হচ্ছে উপদেশ' হাদীসে বর্ণিত এই নীতির সার্থক বাস্তবায়ন করে, একে অপরকে সৎ উপদেশ দান করে। মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য না হয়ে যদি ছোট-খাট শাখা-প্রশাখার পার্থক্য হয়, তাহলে এতে কিছু আসে যায় না এবং এ জন্য শত্রুতা, বৈরিতা ও লাঠা-লাঠি করা নিষ্প্রয়োজন। কোন এখতেলাফের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি কোন বক্তব্য না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে সমাধান বের করতে হবে এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বিত মতামত গ্রহণ করে প্রশাসক উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন।

৫. সাম্য

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পঞ্চম মূলনীতি হল সাম্য। ইসলাম সবার জন্য সাম্যকে ফরয করে দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَكُمْ . الحجرات١٣ :

হে মানুষ, আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাবান, তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু। (সূরা হুজরাত : ১৩)

হাদীসের মধ্যে আরো পরিষ্কারভাবে এসেছে:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَاسْنَانِ الْمُشْطِ الأَفَضْلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي ولا الأبيض عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوى-

মানুষ চিরুনীর দাঁতের অনুরূপ সমান। অনারবের উপর আরবের কিংবা লালের উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, হ্যাঁ, পার্থক্য শুধু আল্লাহভীতির ভিত্তিতে।

নবী (সা) এর উপর আরো জোর দিয়ে বলেন:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهُمْ بِآبَائِهِمْ فَالنَّاسِ لِأَدَمَ وَآدَمَ مِنْ تُرَاب- ِ

আল্লাহ ইসলামের বদৌলতে বংশের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের মিথ্যা গর্ব ও অহংকার থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। সব মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।

৬. স্বাধীনতা

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ষষ্ঠ নীতি হচ্ছে স্বাধীনতা। ইসলামে চিন্তা, বিশ্বাস ও বক্তব্যের স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি সত্যের জন্য এবং বাস্তব বিরোধী কিছুর বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করাকে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। কুরআনে এসেছে:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - ال عمران(١٠٤:

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

আল্লাহর নবী বলেন:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَان- ِ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় দেখবে, সে যেন তার হাত ও শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করে, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সে বাকশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবে, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্যায় রোধে অন্তর দিয়ে চিন্তা ফিকির করবে (ঘৃণা করবে কাজকে) আর এই সর্বশেষ স্তরটি হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

এই স্বাধীনতা তখন পর্যন্ত হরণ করা যাবে না যতক্ষণ না তা ভাল নিয়ম, নৈতিক চরিত্র ও সাধারণভাবে সর্বজন স্বীকৃত আইনের বিরুদ্ধে চলে যায়। বাক-স্বাধীনতা হল মৌলিক বিষয়।

রাসূল (সা) বলেন:

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ أَنْ تَقُولَ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمُ فَقَدْ تَوَدَّعُ مِنْهَا-

যদি দেখ যে আমার উম্মত যালেমকে 'যালেম' বলতে ভয় পায় তাহলে সে উম্মতের কথা ছাড়। অর্থাৎ এ উম্মত দিয়ে কোন কাজ হবে না।

শহীদ শ্রেষ্ঠ হযরত হামযা একদা দেখলেন যে, জনৈক লোক তার প্রতিবেশীনীর উপর চড়াও হচ্ছে, তখন তিনি তাকে উপদেশ দিলেন ও নিষেধ করলেন এবং পরে হত্যা করে ফেললেন।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যুদ্ধ, সামাজিক জীবন ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের সমাধান সম্পর্কে আমি আর বেশী বলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না। একথা সত্য যে, এগুলোতেও ইসলামের বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চাইতে যুক্তিসংগত।

এ প্রসঙ্গে আমি আল্লাহর নিম্ন বক্তব্যকে অবশ্যই তুলে ধরব:

لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا - الكهف٤٩ :

ছোট বড় সব কিছুর পরিসংখ্যান আল্লাহর কাছে আছে। (আল কাহাফ: ৪৯)

পূর্ণতা, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা, স্থায়িত্ব

অন্যান্য মতাদর্শের তুলনায় ইসলামের তিনটি বৈশিষ্ট্য জানাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, পূর্ণতা। বর্তমান ও ভবিষ্যতে সব মানুষের প্রয়োজন পূরণে এ জীবন ব্যবস্থা সক্ষম।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা। এই আদর্শ জাতীয় জীবনের উচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল স্থায়িত্ব। ইসলামী আইন মানব রচিত আইনের তুলনায় স্থায়ী। স্থান ও কাল ভেদে ইসলামী আইনে মৌলিক বিষয়গুলো পরিবর্তিত না হওয়া সত্ত্বেও সর্বযুগ ও সর্বত্র তা সম্পূর্ণ উপযোগী।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে:

انَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وإنا له لحفظون - الحجر :

আমরা উপদেশ নাযিল করেছি এবং আমরাই তার সংরক্ষণ করবো।
(সূরা আল হিজর: ৯)

ইসলামের এসব বিভিন্নমুখী বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলো একই উৎসের দিকে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় আর তা হল ইসলাম, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসত তাহলে এতে পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের মত গুণাবলীর সমাবেশ হতো না।

যুবকদের প্রতি আহ্বান

সব জীবন ব্যবস্থার মহত্ব ও তা কায়েমের পেছনে শক্তির উৎস ছিল যুবকেরা। তারাই ঐসব জীবন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে। মানব রচিত মতবাদ কায়েমের জন্য যদি এমন যুবক পাওয়া যায় যারা সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করে, যৌবনকে বাজী রেখে রাত পর্যন্ত জাগরণ করে, তাহলে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য কি আল্লাহর এমন কোন যুবক পাওয়া যাবে না যারা ইসলামের ঝাণ্ডাকে উপরে তুলে ধরবে, এর দিকে মানুষকে ডাকবে এবং স্বয়ং নিজেরা এর সুফল ভোগ করবে?
হে মুহাম্মদ, ওমর, খালেদ ও বিশ্ব বীরের সন্তানেরা, আপনাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে? দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাত্মক কল্যাণকামী আপনাদের জীবন ব্যবস্থা থেকে আর কোন জীবন ব্যবস্থা বেশী পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ হতে পারে?

বিশ্বাস করুন, আপনারা অন্যদের তুলনায় কম সাহস, কম মর্যাদা ও কম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী নন। আপনারা কিছুতেই রাশিয়া ও চীনের বাতিল আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী যুবকদের থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন নন কিংবা আপনারা আমেরিকা, বৃটেন ও হল্যান্ডের ঐ সমস্ত যুবকদের থেকেও নিকৃষ্ট নন, যারা সারা দুনিয়ায় তাদের সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হে অমিততেজা যুবক বন্ধুরা! সত্যের প্রত্যয়দীপ্ত ও গগণবিদারী আওয়াযে ঘোষণা করুন, আপনারা ইসলামের সাথে অন্য কোন ব্যবস্থাকে সমান মনে করেন না এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মতবাদের অনুসরণ করবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হউন যে, আপনার জ্ঞানকে আন্তরিকভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করবেন এবং আপনার যৌবনকে ইসলাম রক্ষার জন্য ওয়াক্ত করবেন, আপনার সময়কে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারে ব্যয় করবেন। তারপরই আপনারা আল্লাহর সাহায্যের আশা করতে পারেন।

আল্লাহ বলেন:

مَنْ يَنْصُرُه ، إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - وَلَيَنْصُرَنَّ الله

(الحج : ٤٠)

যারা আল্লাহকে দ্বীন কায়েমে সাহায্য করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও শক্তিধর। (সূরা হাজ্জ: ৪০)

والسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه- ُ

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্